প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

ঈদুল আযহা সংখ্যা

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১৩ জ্বিলহজ্জ, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ তাবুক, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ঈসাব্দ

৮০টি দেশের ৩৮ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ মানুষের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যের ৫০তম জলসা সালানা সফলতার সাথে সমাপ্ত

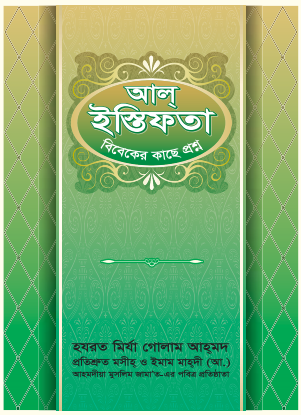

যুক্তরাজ্যের ৫০তম সালানা জলসায় উদ্বোধনী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করছেন মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

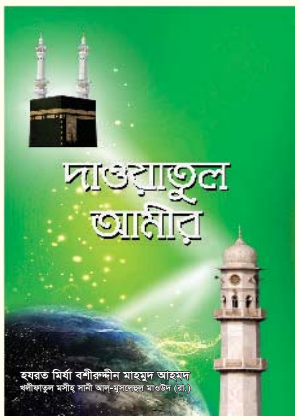

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

সম্পাদকীয়

মহান আল্লাহ্‌র কৃপা বারিধারায় যুক্তরাজ্যের অর্ধ শততম সালানা জলসার সফল সমাপ্তি

সারা বিশ্বে বিগত এক বছরে ৫,৮৪,৩৮৩ জনের বয়আত গ্রহণ

গত ১২, ১৩ ও ১৪ আগস্ট ২০১৬ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৫০তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বিনাসরিহিল আযীয-এর পবিত্র সত্তার উপস্থিতি এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করা এই জলসার কার্যক্রম সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌! জলসার এই তিন দিন শুধু যুক্তরাজ্যেই নয় বরং আহমদীয়া খিলাফতের কল্যাণে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। জলসার এই তিন দিন বরকত মন্ডিত হয়ে আশিস বিতরণের দিনে পরিণত হয়েছিল।

এবারের জলসায় ৮০টি দেশ থেকে ৩৮ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগদান করে নিজেদেরকে কল্যাণমন্ডিত করেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার বরকত পেতে সারা বিশ্বের ২০৯টি দেশের লক্ষ-কোটি আহমদীরাও সম্পৃক্ত হোন। জলসায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, এমপিসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে গত এক বছরে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপাবারি বর্ষণ-ধারার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তুলে ধরেন। তাঁর ভাষন থেকে স্পষ্ট হয় আল্লাহ্‌ তা'লা এ জামা'তকে তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে পূর্বের ন্যায় এবছরেও আরো ১টি নতুন দেশে আহমদীয়া জামা'তের চারা রোপনের সৌভাগ্য দান করেছেন। দেশটি হলো প্যারাগুয়ে। সারা বিশ্বে গত এক বছরে ৫লাখ ৮৪ হাজার ৩৮৩ জন বয়আত গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র মনোনীত পবিত্র এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ জলসায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ-গোষ্ঠী ও ভাষা-ভাষী মানুষেরা স্ব-দেশের কৃষ্টি-কালচারের অবয়বে উপস্থিত হলেও, জলসায় তারা সবাই মহা-মিলনের মোহনায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

সমাপ্তি বক্তৃতায় হুযূর (আই.) বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এ থেকে উদ্ধারের কার্যকর উপায় কি তা তুলে ধরে আল্লাহ্‌ তা'লার নির্ধারিত ঐশী ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্ববাসী ও বিশ্ব নের্তৃবর্গের দৃষ্টি পুণরায় আকর্ষণ করেন। হুযূর (আই.) তার এ বক্তৃতায় পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের বিষয়টিও পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। হুযূর বলেন, পিতামাতার অনুগ্রহের প্রতিদান কোন ক্রমেই দেয়া যেতে পারে না। তাদের সাথে সর্বাবস্থায় কোমলতা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করা উচিত।

উন্নত বিশ্বে সন্তানেরা সভ্যতার নামে পিতামাতাকে সময় দেয় না, দেখা-সাক্ষাৎ করে না। বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েই তারা মনে করে সন্তানের যথার্থ দায়িত্ব পালন হচ্ছে, অথচ মোটেই তা নয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয় উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, অনেক দেশ আইন বানায়, বেশী সংখ্যায় সন্তান নেয়া যাবে না। ফলে অনেক রাষ্ট্রে এ কারণে সন্তান নষ্ট বা অবাধে ভ্রুণ হত্যা করা হয়। তবে ইদানিং কোন কোন দেশে অবস্থা পাল্টাতেও শুরু করেছে।

বিশ্ব-মানবতার সুরক্ষায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.) মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে দিকদর্শী পথ-নির্দেশনা দান করে এই জলসায় যেমন বক্তব্য দান করেছেন, তেমনই মানবতার কল্যাণার্থে আন্তরিক মর্মবেদনা নিয়ে ইজতেমায়ী দোয়াও পরিচালনা করেছেন।

আল্লাহ্‌ তা'লার সমীপে আমাদের সকরুণ নিবেদন, যুগ-খলীফার আন্তারিক আহ্বান, মমতাময় যাচনা কবুল করে বিশ্বকে ধ্বংসের কবল থেকে তিনি রক্ষা করুন আর–মানবজাতি এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে মান্য করে তাঁর জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মহান স্রষ্টার করুণার চাদরে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাক। আমীন।

ঈদুল আযহায়– কুরবানীর মাহাত্ম্য

সেই ইবাদত যা পরকালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে তা হলো, নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য আত্মাকে জবাই করা। আর এই আত্মা যা মন্দকর্ম করায় বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে আর এই নফসে আম্মারা হলো এমন এক নির্দেশদাতা, যে সর্বক্ষণ মন্দ ও অন্যায় কর্মের আদেশ দিতে থাকে। অতএব, কুরবানীকারী মন্দকর্মের নির্দেশদাতা নফসের আম্মারা-কে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিচ্ছিন্নকারী ছুরি দিয়ে জবাই করে দেয়। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ: ৩৫)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'প্রকৃত কুরবানী হলো এমন এক বাহন যা খোদা তা'লার নৈকট্যে পৌঁছায়। আর ভয়, শঙ্কাকে প্রশমিত করে কুরবানীদাতার বিপদাবলী নির্বাসিত করে ছাড়ে। এজন্য কুরবানী যথার্থই আল্লাহ্‌ তা'লার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। (খুতবা ইলহামীয়া, পৃ: ৪৪-৪৫) অতএব, ঐ গোপন রহস্যের প্রতি খোদা তা'লার কালাম ইঙ্গিত দেয়, চির সত্যের ধারক যিনি। তিনি তাঁর রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ করে বলেন ঐসব লোকদেরকে বলে দাও যে, "আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা, আর আমার মৃত্যুবরণ করা সবটাই খোদা তা'লার জন্য, যিনি জগতসমূহের অধিপতি। অতএব অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর নুসক (কুরবানী) শব্দটিতে হায়াত (জীবন) ও মুমাত (মরণ) শব্দ দু'টির সাথে সঠিক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কত সুন্দর ও সঠিকভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৩)। অর্থাৎ মরণেই জীবনের উত্থান।

কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে স্বচ্ছ অন্তরে নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরবানী করলে কুরবানী দাতা নিজেকে, নিজের পুত্রদেরকে ও পৌত্রদেরকেও কুরবানীতেই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। আর একারণে তার জন্য সম্মানিত মহান এক পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে যায় যেমনটা লাভ হয়েছিলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৪)। আর পরিণামে জগত পেয়েছে রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-কে।

পবিত্র এই কুরবানীর ঈদে আমাদের করা পশু কুরবানীকে ছাপিয়ে আমাদের নফসের কুরবানী হয়ে উঠুক আর মহান আল্লাহ্‌ তা'লা তা গ্রহণ করে সেই পুরস্কারের ভাগী করুন। আমাদের ব্যক্তি ও জামা'তী জীবনে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মহান পুরস্কারে উদ্ভাসিত হোক।

সকলকে

ঈদ মোবারক

সূচিপত্র

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত
ঈদুল আযহার খুতবা

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৪
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২২শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা**

ধর্মের নামে রক্তপাত ২২
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা**

বয়আতের শর্তসমূহ এবং ৩১
একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

কলমের জিহাদ ৩৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

মানুষ মানুষের জন্য ৩৫
মাহমুদ আহমদ সুমন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল-এর সাহিত্য ৩৭
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ
মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

ইসলাম ধর্ম দাবি নিয়ে ভাবতে শিখায় ৩৮
মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

জাতির নেতা সেবক ৪০
মৌলবী এনামুল হক রনি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৪২
৫০তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

নবীনদের পাতা- **আত্মত্যাগের মহিমায় ঈদুল আযহিয়া** ৪৭
মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ

প্রকৃত অর্থে কুরবানীর গুরুত্ব ৪৯
লাকী আহমদ

ইসলামে কুরবানীর শিক্ষা ৫০
আনোয়ারা বেগম

সংবাদ ৫১

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ৫৪
৪৫তম জাতীয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬ সিলেবাস

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৫৫

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর ৫৬
বিশেষ দোয়ার তাহরীক

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হাজ্জ-২২

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ
عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ
كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর, যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি, সেগুলোতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে, তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)-দেরকেও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরকেও (খাওয়াও)[১৯৫৪]। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ, তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে সুসংবাদ দাও।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে, তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত, যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ-অবস্থার ওপর সমুজ্জলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ-শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না, বরং এই আনুষ্ঠানিকতার ভেতরের তাক্ওয়ার প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত-শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, কেবল অন্তরের তাক্ওয়াই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা-কিছু আছে, আল্লাহ্ তা'লা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন–আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয়-ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ-জীবন পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট চান না এবং আশা করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, বাহ্যিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সে-জন্য বাহ্যিক-কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এও সত্য যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোলসস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ-প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে, কোন বস্তুর দেহাবরণ এর শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ, কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক

* হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

* হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ঈদে রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুসর রঙের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। এদেরকে তিনি নিজ হাতে যবাই করলেন এবং যবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, যবাই করার সময়ে আমি তাঁকে উহাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে দেখেছি এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি (প্রাগুক্ত)।

* হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছর-বয়সী বাচ্চা-ছাগল রয়ে গেল। বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর (সা.) বল্লেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে , আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (প্রাগুক্ত)।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই কুরবানীর পশু যবাই করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

* হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম-দশক আসে, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে) । অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে-ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে (মুসলিম)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যে-পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পিছনের দিকে ফিরে গেছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

* হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরবানী কী? হুযূর (সা.) উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের সুন্নত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের ক্ষেত্রে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী

প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আর একটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ, যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য-রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)।

"ক্বা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার বাহ্যিকতার সকল পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয়-প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের-প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী-আইনে হজ্জের প্রকৃত-অর্থ এটাই"। ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত- তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক-কর্ম আধ্যাত্মিক-হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন।

কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদেরকে 'হাজী' বলুক, এ-জন্যই অসৎ-উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না, কেননা, তারা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক-বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগের মাস' বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমনভাবে তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত-সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের-আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড)

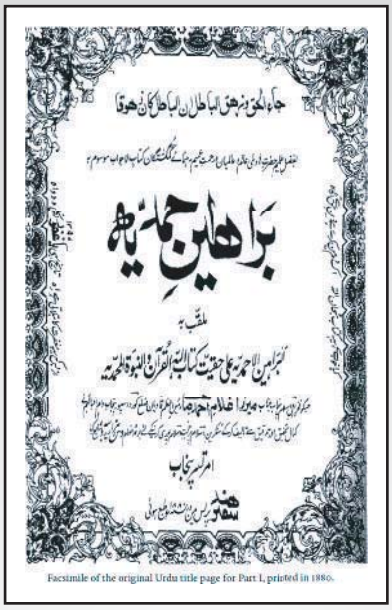

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২২তম কিস্তি)

অতএব এই পুরো গবেষণা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, অনন্যতার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য ঐশী কর্ম ও ঐশীবাণীর ক্ষেত্রেই সত্য। সকল বুদ্ধিমান মানুষ জানে যে, খোদার ঈশ্বরত্ব মানার জন্য সুমহান মাধ্যম যা বুদ্ধি বা বিবেকের মধ্যে রয়েছে,তা হলো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উৎসারিত প্রতিটি বিষয় অনন্যতার এমন স্তরে উপনীত যে, তা এক-অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য বহন করছে। যদি এ মাধ্যম না থাকতো তাহলে বিবেক বা বুদ্ধির জন্য খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পথ রুদ্ধই থাকতো। আর যেখানে খোদাকে চেনা এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে, যা কিছু তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে তাকে অনন্য ও অতুলনীয় বলে মেনে নাও! সেখানে একই বৈশিষ্ট্য যা খোদার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা বান্দাদের জন্যও প্রস্তাব করা বিবেক ও ঈমানের মূলোৎপাটনেরই নামান্তর।

অথচ একথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ় প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বান্দার কোন কাজ অনন্য বা অতুলনীয় নয় আর খোদার সকল কাজ এবং যা কিছু তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত হয়েছে সবই অতুলনীয়।

যদি এমন নিখুঁত আরোহ যুক্তিতেও তোমাদের বিশ্বাস না থাকে যা খোদার সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে; তাহলে যুক্তি-বুদ্ধি বা প্রকৃতির নিয়মের কথাই আর মুখে আনবেনা, বরং যুক্তি ও দর্শনের বাজে গ্রন্থাবলী ছিঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দাও। একটি মাছি যা দেখতেও রুচি হয় না, তা স্বীয় বাহ্যিক আকৃতি ও আভ্যন্তরীন গঠন-বিন্যাসে এতটা অনন্য যে এর ওপর দৃষ্টিপাতে খোদার পক্ষ থেকে এর সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু খোদার বাণী বা উক্তির বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতা কী এতটা অতুলনীয় ও অনন্যও হতে পারে না যার ওপর দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হবে যে, সেই

বাণী বা গ্রন্থ খোদার পক্ষ থেকে! এর অন্যথা ভাবতে কী তোমাদের লজ্জা হয় না? হে উদাসীনরা! হে বিবেক-বুদ্ধিহীনরা! খোদার বাণীর বাগ্মিতা কি মাছির ডানা ও পা থেকেও নিম্নমানের এবং গুণগত মানে নিতান্তই তুচ্ছ?

কতই না পরিতাপের বিষয় যে, একটি মাছির দৈহিক বিন্যাস ও গঠন সম্পর্কে তোমরা পরিস্কারভাবে স্বীকার কর যে, এভাবে গঠন-গড়ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না; অথচ ঐশী বাণী সম্পর্কে বল যে, তা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে! বরং বিতর্ক ও বিতন্ডার ছলে এই যুক্তি দেখাও যে, যদিও এ পর্যন্ত কোন মানুষ এটি বানাতে সক্ষম হয়নি কিন্তু এ কথার কি প্রমাণ আছে যে ভবিষ্যতেও পারবে না? হে নির্বোধরা! এর প্রমাণ তাই যা তোমরা মশা-মাছি এবং বৃক্ষের পাতায় পাতায় পরিস্কারভাবে লক্ষ্য করএবং স্বীকার কর,কিন্তু এই ঐশী জ্যোতি দেখার সময় তোমাদের চোখ পেঁচার ন্যায় অন্ধ বা ঝাপসা হয়ে যায়। তাই তোমরা মাছির স্বভাবের বশবর্তী হয়ে মাছির মাহাত্ম্যেই বিশ্বাসী, খোদার জ্যোতিতে নয়। যেসব শব্দ সম্পর্কে বল যে, এগুলো স্বীয় অর্থসহ খোদার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, সেগুলোকে তোমরা সেই লালার মতও মনে কর না যা মৌমাছির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুসারে মানুষ মধু তৈরীর শক্তি না রাখলেও খোদার কথা বা ঐশীবাণী বানানোর শক্তি রাখে। অর্থাৎ তোমাদের কাছে পোকা-মাকড় এত মনঃপূত হলো আর এতটাই পছন্দ হয়ে গেল যে, খোদার উক্তি এসবেরও সমপর্যায়ের নয়।

হে অজ্ঞরা! যদি খোদার বাণী অনন্য না হয় তাহলে কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষের পত্রপল্লবের অনন্য হওয়ার সংবাদ তোমাদের কাছে কোথা থেকে পৌঁছুলো? তোমরা আদৌ চিন্তা-ভাবনা করো না যে, ঐশী বাণীর বিন্যাস ও গঠনে যদি একটি কীটের বিন্যাসের ন্যায়ও উৎকর্ষতা না থাকে তাহলে এটি খোদার বিরুদ্ধেই আপত্তির নামান্তর। কার্যত তিনি (দুনিয়ার দৃষ্টিতে) তুচ্ছকে উচ্চের বা অধমকে উত্তমের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছেন আর তুচ্ছের হাতে স্বীয় সত্তার বিরুদ্ধে সেই প্রমাণ দান করেছেন যা উচ্চকে দান করেননি।

কুরআনের সৌন্দর্য ও সুষমা সকল মুসলমানের প্রাণের জ্যোতি। অন্যদের চাঁদ হলো চন্দ্র, কিন্তু আমাদের চাঁদ হলো কুরআন।

আমরা চিন্তা করে দেখেছি কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আমরা এর কোন জুড়ি খুঁজে পাই না, আর তা অনন্য কেনই বা হবে না, কারণএটিতো রহমান খোদার বাণী সেই গুণ উদ্যানেও নেই এবং এর মত কোন বাগানও নেই। খোদার পবিত্র বাণীর আদৌ কোন সমকক্ষ নেই, হোক না তা ওমানের মুক্তো আর বাদাখশাহ্‌র মণি-মাণিক্য। মানুষের উক্তি কীভাবে খোদার কথার সমান হতে পারে! সেখানে রয়েছে শক্তিমত্তা আর এখানে দুর্বলতা– দু'য়ের পার্থক্য অতি স্পষ্ট। ফিরিশতা যার সন্নিধানে অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে তাঁর সমকক্ষতা অর্জন মানুষের পক্ষে কী করে সম্ভব হতে পারে? মানুষ যেখানে কোনভাবে কীট-পতঙ্গের একটি পা পর্যন্ত বানাতে সক্ষম নয়, সেখানে সত্যের জ্যোতি বানানো তার জন্য কী করে সম্ভব হতে পারে? হে মানুষ, খোদার মাহাত্ম্যের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাশীল হও, যৎকিঞ্চিত ঈমানও যদি থাকে তাহলে এখনও সময় আছে মুখ সামলাও, অন্যদের খোদার সমকক্ষ বানানো ভয়াবহ কুফরী । হে বন্ধুগণ, খোদাকে কিছুটা হলেও ভয় কর। মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপ করা -এটি কেমন বিচার?

যদি খোদার এক ও অদ্বিতীয় সত্তাকে মেনে থাক তাহলে তোমাদের হৃদয়ে কেন এত প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান? তোমাদের হৃদয়ে অজ্ঞতার এ কেমন পর্দা পড়ল? তোমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত, বিরত হও, যদি কিছুটা খোদাভীতি থাকে। আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ নেই, এটি বিনয়াবনত সদুপদেশ মাত্র। যদি কেউ পবিত্রমনা হয়ে থাকে তাহলে আমার অন্তরাত্মা তার জন্য নিবেদিত।

এ পর্যন্ত ঐশী বাণী বা কুরআনের অনন্যতা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা এ যুগের দুর্বল বিচার-বুদ্ধির মানুষ ও অতি-স্বাধীন মুসলমানদের জন্য বর্ণিত হয়েছে যাদেরকে ইংরেজীর সোফিস্ট দর্শন (যারা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে না বা যারা সত্যকে আপেক্ষিক গণ্য করে) ও প্রতারণামূলক শিক্ষা দাম্ভিক ও অন্ত-র্দৃষ্টিহীন করে পবিত্র কুরআন যে অনন্য ও অতুলনীয়এবং এর খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারে প্রবৃত্ত করেছে। যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, পবিত্র কুরআনে ঈমান এনে এবং কলেমা পড়ার ভান করে অবিশ্বাসীদের ন্যায় আল্লাহ্‌র বাণীকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক তুচ্ছ মানুষের কথার মত মনে করে বসে আছে। এরা আয়াত 'ওয়ামা ক্বাদরি হিয়া ক্বাল্লাহা ক্বাদারু' সত্যায়নস্থল হয়ে খোদার মহাকুদরত এবং প্রজ্ঞাসমূহকে ভুলিয়ে দিয়েছে, যা দেখার জন্য খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বা উৎসারিত প্রতিটি বস্তু খোদা-দর্শনের আয়নাস্বরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু এসব সত্য এত প্রদীপ্ত ও স্বচ্ছ যে, কোন ব্যক্তি মুসলমানদের জামা'তভুক্ত না হলেও সার্বিক অর্থের নিরিখে সে বুঝতে পারে। যে বাণীকে আল্লাহ্‌র বাণী বলা হবে এর অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া আবশ্যক কেননা; সকল বিবেকবান ব্যক্তি খোদার প্রকৃতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করে এবং সকল বস্তু যা তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তাকে সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ও মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে বলে পরখ করে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঈদুল আযহার খুতবা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত ঈদুল আযহার খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করছি। আমাদের সবাই জানে যে, এই ঈদ এবং হজ্জের সম্পর্ক হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর সাথে। এই ঈদের সম্পর্ক সেই যুগের সাথে যখন আদম সন্তানদের মাঝে ব্যক্তিগত কুরবানীর অন্যতম মান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজ বংশ বা প্রজন্মে কুরবানীর এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথমবার তখন করেছেন যখন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মূর্তি ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করে স্বজনদের বিরোধিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আর এরপর আগুনেও নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, এটি ছিল তখনকার কুরবানী। এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেই আগুনকে তার জন্য সুশীতল ও ঠান্ডা করে দেন আর তিনি নিজের সন্তানকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবান করতে প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যমে নিজের বংশ ও নিজ আওলাদ বা প্রজন্মকে কুরবানী করেছেন আর একইভাবে সন্তানও কুরবানী দিয়েছে। অতএব এটিজবাই হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার দিক দিয়েও কুরবানী ছিল আর নিজের ছেলেকে নিজ থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার দিক দিয়েও কুরবানী ছিল। কিন্তু এই যে, জবাই করা বা জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া, এটি হয়তো সেই যুগের নিরীখে খুব বড় কুরবানী নয় কেননা যেই যুগে হযরত ইবরাহীম (আ.) বসবাস করতেন সেই যুগে মানুষ জবাই করা বা মানুষকে কুরবানী দেয়ার রীতি ছিল। কিন্তু এই কুরবানীর মান তখন উন্নত হয় যখন আমরা দেখি যে, নব্বই বছর বয়সের কাছাকাছি গিয়ে একটি সন্তান লাভ হয় আর তিনি সেই ছেলেকে বা সেই সন্তানকে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। আমরা যখন দেখি যে, নিজের স্ত্রী-পুত্রকে এক তৃণলতাহীন স্থানে বা জনমানবশূন্য স্থানে তিনি ছেড়ে আসেন, এটি

নিজের প্রজন্ম বা নিজের বংশকে কুরবান করার অনেক বড় একটি দৃষ্টান্ত, কেননা এমন স্থান যেখানে খাওয়ারও কিছু নেই, পান করারও কিছু নেই, আর বন্য বা হিংস্র পশুর আশংকা থাকে সেখানে নিজ স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে আসা সামান্য বা তুচ্ছ কোন কুরবানী নয়। কিন্তু এই কুরবানীও সব কিছু ছিল না। এই কুরবানী তো কেবল সেই কুরবানীর সূচনা ছিল যা পরম মার্গে উপনীত হওয়ার কথা ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লার এটি বলা বা এটি বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি মানুষকে কুরবানীর কত উন্নত মানে পৌঁছাতে পারি।

অতএব আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সেই পরম মার্গ লাভ হয়েছে। মানুষ সেই পরম মার্গে পৌঁছেছে পূর্ণ মানবের মাধ্যমে যার নমুনা এবং যার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থন আমরা তিনি (সা.)-এর পুরো জীবনে দেখতে পাই। নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন আমাদের জন্য একটি আদর্শ বা নমুনা। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন আমাদের সামনে এক পূর্ণ আদর্শ। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে যা কিছু দেখা যায় তার পরম মার্গ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে যেসবঘটনা ঘটেছে আরতিনি যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাকে সাহায্য এবং সমর্থন দিয়েছেন, এর মহান দৃষ্টান্ত এবং আরো ব্যাপকতর নমুনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে আমাদের চোখে পড়ে, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এটি প্রমাণিত সত্য যে, আমাদের নেতা ও মনীব রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শে এবং প্রকৃতিতে পৃথিবীতে এসেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) একত্ববাদকে ভালোবেসে যেভাবে নিজেকে আগুনে ঠেলে দিয়েছেন বা আগুনে নিক্ষেপ করেছেন এবং এরপর

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا

(সূরা আল্-আম্বিয়া: ৭০) উক্তির মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছেন অনুরূপভাবে আমাদের নবী (সা.)ও একত্ববাদের প্রেমে ও ভালোবাসায় নিজেকে নৈরাজ্যের সেই অগ্নিতে ঠেলে দিয়েছেন যা তাঁর আবির্ভাবের পর পৃথিবীর সকল জাতিতে তথা সমগ্র বিশ্বে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লারনিজের উক্তি

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

(সূরা আল্-মায়েদা: ৬৮)-এর মাধ্যমে সেই অগ্নি থেকে তাকে স্পষ্টভাবে রক্ষা করা হয়েছে। আমাদের নবী (সা.)ও একইভাবে সেসব প্রতিমাকে নিজ হাতে খন্ড বিখন্ড করেছেন যা খানা কাবাতে রাখা ছিল যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রতিমা খণ্ড-বিখণ্ড করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যেভাবে কাবা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অনুরূপভাবে আমাদের নবী (সা.) সারা পৃথিবীকে খানা কাবার প্রতি আকর্ষণকারী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হওয়ার ভিত্তি রচনা করেছেন কিন্তু আমাদের নবী (সা.) সেই ভিত্তিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। খোদার কৃপা এবং দয়ার ওপর তার এতটাই ভরসা ছিল যে, প্রত্যেক সত্য সন্ধানীর উচিত সে যেন তার কাছ থেকে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা শিখে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন এক জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের ভিতর একত্ববাদের নাম চিহ্নও ছিল না, আর কোন কিতাবও ছিল না। অনুরূপভাবে আমাদের নবী (সা.) সেই জাতিতে প্রেরিত হয়েছেন যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল, আর কোন ঐশী গ্রন্থও তাদের হাতে ছিল না। আরো একটি সাদৃশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়কে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছেন, এমনকি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তিনি সকল আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিতশ্রদ্ধতা প্রকাশ করেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। অনুরূপ বরং এর চেয়ে বেশি ঘটনা আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে ঘটেছে। যদিও মক্কায় এমন কোন ঘর ছিল না যে ঘরের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক ছিল না অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রায় সবার সাথেই ছিল কিন্তু খোদার দিকে আহ্বানের কারণে সবাই তাঁর শত্রু হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ তার সঙ্গ দেয়নি।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিঃসঙ্গ পেয়ে এত সন্তান সন্ততি দান করেছেন যাদের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মত অগণিত অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-কে একা ও নিঃসঙ্গ পেয়ে অগণিত ও অশেষ দানে ভূষিত করেছেন এবং তার সঙ্গী হিসেবে এমন সব সাহাবা তাকে দান করেছেন যারা আকাশের নক্ষত্রের মত সংখ্যায় কেবল অগণিতই ছিল না বরং তাদের হৃদয় তৌহীদের আলোতে ঝলমল করে উঠে।

অতএব দেখুন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য মুশরিক বা পৌত্তলিকরা অগ্নি প্রজ্জলিত করেছে যেভাবে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যে, তাকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা সেই আগুনকে শীতল বা ঠান্ডা করার জন্য বৃষ্টি নাযেল করেন এবং সেই আগুন ঠান্ডা বা শীতল হয়ে যায়। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) তা থেকে রক্ষা পান। পৌত্তলিকরা যেহেতু বাহ্যিকতা বা বাহ্যিক জিনিসকে দেখে থাকে, তাই যখন তারা দেখলো যে, আগুন প্রজ্জলিত করার পর মেঘমালা এসে মুষলধারে বৃষ্টি হয় আর আগুন নিভে যায় তখন তারা কুসংস্কারে লিপ্ত হয় যে, হয়তো এটিই আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা। তাই তারা ইবরাহীম (আ.)-কে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মক্কা বাসীরা ব্যর্থতা দেখা সত্ত্বেও দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জলিত রাখে কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়। আর যে যুদ্ধ বিগ্রহ তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জ্বালানো ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং ধ্বংস করার জন্য করেছিল সেই যুদ্ধই তিনি (সা.)-এর উন্নতির ও অগ্রগতির কারণ হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

(সূরা আল্-মায়েদা: ৬৮) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন,

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

(সূরা আল্-মায়েদা: ৬৮) অর্থাৎ খোদা তা'লা তোমাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন। অথচ মানুষ তাঁকে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ দিয়েছে, দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, তাঁর দাত শহীদ করা হয়েছে, তার আঙ্গুল ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, তরবারীর বহু আঘাত তার কপালে লেগেছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও আপত্তির কিছু নেই কেননা কাফিরদের আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য বা আসল উদ্দেশ্য মহানবী (সা.)-কে আহত করা বা তাঁর দাত শহীদ করা ছিল না বরং তাঁকে হত্যা করা ছিল তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। অতএব আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের আসল উদ্দেশ্য থেকে মহানবী (সা.)-কে নিরাপদ রেখেছেন।

অপর এক জায়গায় তিনি বলেন,

মহানবী (সা.)-এর কারো হাতে নিহত না হওয়া অনেক বড় একটি নিদর্শন বা মু'জিযা। এটি কুরআনের সত্যতার একটি প্রমাণ কেননা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী হলো,

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

(সূরা আল্-মায়েদা: ৬৮)। আর পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ যুগের নবী কারো হাতে মারা যাবেন না। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সাময়িকভাবে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল আর আগুন নিভে যাওয়াকে মুশরিকরা একটি অলক্ষুণে ভাব মনে করে এবংএরপর আর দ্বিতীয় বার আগুন জ্বালায়নি। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বছরের পর বছর এই আগুন প্রজ্বলিত রাখা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, চেষ্টা করে দেখ তোমরা কখনো সফল হবে না আর তারা সফল হয়ওনি। সুতরাং এক চ্যালেঞ্জের বর্তমানে সেই চ্যালেঞ্জ খন্ডন করতে না পারা চ্যালেঞ্জ দাতারই সফলতা বা সাফল্য গন্য হয় এবং এতে সেই ভবিষ্যদ্বাণীরও মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়। এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার জাতি বা তার বংশ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা সব জাতির পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে এবং তখন যে সমস্ত স্থানে তাঁর পয়গাম বা বাণী পৌঁছেছে সেখানেও জ্বালানো হয়েছে। বরং আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে এই আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে। আর এই আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য হলো কোন না কোন ভাবে তাঁকে দুর্নাম করা, কোন ভাবে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত নাম সর্বস্ব বা নামধারী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা অথবা এমন এক ধর্ম হিসেবে তুলে ধরা যার কোন মূল নেই বা আসল রূপ অক্ষুন্ন নেই।

কিন্তু অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে, তোমরা কখনো তা করতে পারবে না কেননা তিনি (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.)-এর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বা সর্বত্র জয়যুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ্। পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একত্ববাদ তথা তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের আবেগ অনুভূতিরও কুরবানী দিয়েছেন এবং স্ত্রী সন্তানেরও কুরবানী দিয়েছেন আর তাদেরকে মক্কায় বসতি স্থাপনের জন্য রেখে যান যেখানে খাওয়ারও কিছু ছিল না আর পান করারও কিছু ছিল না। কিন্তু খোদার নির্দেশে তাদেরকে এখানে রেখে যাওয়া আবশ্যক ছিল যেন খোদার প্রথম ঘর সেই ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় যার চিহ্ন মুছে গিয়েছিল এবং পৃথিবীতে পুনরায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেভাবে কাবা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) দোয়া করেছিলেন যার কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٨﴾

(সূরা আল্-বাকারা: ১২৮)

অর্থাৎ আর যখন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এই দোয়ার মাধ্যমে সেই বিশেষ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ কর কেননা তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী। এরপর দোয়ার পরের অংশ হলো,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٩﴾

(সূরা আল্-বাকারা: ১২৯)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দু'জন অনুগত বান্দায় পরিণত কর এবং আমাদের বংশ থেকেও তোমার এক অনুগত উম্মত সৃষ্টি কর। আর আমাদেরকে তোমার ইবাদত এবং কুরবানীর রীতি পদ্ধতি শিখাও আর আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর কেননা তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

সুতরাং হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর দোয়া গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পায় এবং তাদের বংশে খোদার অনেক অনুগত বান্দার জন্ম হয়। আর তারা এমন অনুগত বান্দা ছিলেন যারা তাদের বংশে আনুগত্যের পরম মার্গে উপনীত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আনুগত্যের রীতি শিখেছেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন আর তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কাবা শরীফকে প্রতিমা থেকে পবিত্র করার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য রাতের ঘুমের পরোয়া করেননি এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু এই ইবাদত এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা সেটি তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে শিখেছেন। এই বিপ্লব যা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে তা মহানবী (সা.)-এর তরবীয়ত এবং দোয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা খোদা প্রেমিক মানুষে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং রসূলে করীম (সা.)-এর কুরবানী এবং দোয়া যেখানে সেসব অজ্ঞদের খোদপ্রেমিক মানুষে পরিণত করেছে সেখানে কাবা শরীফ যা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তওহীদের পরিবর্তে শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল এবং শত শত প্রতিমা যেখানে রাখা হতো, তা প্রতিমা মুক্ত করেন আর

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২)

অর্থাৎ সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে আর মিথ্যার অদৃষ্টে পলায়নই লিখা আছে- এই নারাহ্ উচ্চকিত করে প্রতিটি প্রতিমা খন্ড বিখন্ড করে কাবা শরীফকে তৌহীদের স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত করেন। যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ সত্তা বা পরিবার পরিজনের কুরবানী দিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন অনুরূপভাবে তিনি (সা.) এটিকে চিরতরে প্রতিমা মুক্ত করে তৌহীদ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে রূপ দেন, সারা পৃথিবীর মনোযোগ কাবা শরীফের প্রতি নিবদ্ধ করেন আর এর খাতিরে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঝুঁকার বা আল্লাহ্‌র দরবারে বিনত হওয়ার ভীত রচনা করেন আর আমাদের নবী (সা.) সেই ভীতকে পরম মার্গে পৌঁছান। আর এখন এটিই তৌহীদের স্থায়ী প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ভীত রচনার কাজ হয়েছে হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আর এটিকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর এখন কিয়ামত পর্যন্ত এটি তৌহীদের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আজ আমরা দেখি যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্জে যায়, কোটি কোটি মুসলমান কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ে, এটি এই কথারই প্রমাণ যে, কাবা শরীফের ভিত্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) ও রসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি কথা বলেন যে, ইবরাহীম (আ.)-এর জাতিতে তৌহীদের নাম চিহ্নও ছিল না আর কোন গ্রন্থও তাদের ছিল না। একইভাবে রসূলে করীম (সা.) যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করেন সেই জাতিও অজ্ঞতার ঘৃণ্য মার্গে পৌঁছে গিয়েছিল। তৌহীদের কোন নাম গন্ধও তাদের মাঝে ছিল না আর কোন ঐশী পুস্তকও তাদের মাঝে ছিল না। কিন্তু সেই কামেল এবং উৎকর্ষ ও শরীয়তের শেষ গ্রন্থ যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং সমস্ত বিষয়ের পরিবেষ্টনকারী গ্রন্থ, সেটি যখন আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর কুরআন আকারে নাযেল করেন তখন তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির কল্যাণে সেই পশুর মত মানুষ যারা বন্য প্রকৃতির মানুষ ছিল, তারা মানুষে পরিণত হয়, অতঃপর সুশিক্ষিত মানুষ হয় এবং তারপর খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত হয়। আর তারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করে এবং সেই গ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আর তাঁর (সা.) কাছ থেকে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা শিখে তাতে পারদর্শী হয়ে তৌহীদের পতাকাবাহী হিসেবে সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এক জায়গায় এভাবে বলেন যে,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ
فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۶۵﴾

(সূরা আলে ইমরান: ১৬৫)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে এক রসূল প্রেরণ করেন যে তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদের পবিত্র করে, তাদের কিতাব এবং প্রজ্ঞা শিখায়, অথচ এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে বা ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন, 'ইয বাআছা ফিহিম রাসূলা' অর্থাৎ যখন তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল প্রেরণ করেন, এর মাধ্যমে মুসলমানদের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে যিনি তাদেরই মত এবং তাদেরই একজন। সুতরাং মুসলমানদের উচিত তাঁর উত্তম আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করা, শান্তির বাণী প্রচার করা, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শিখা এবং শিখানো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আজ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এই শিক্ষাকে ভুলে বসেছে, আর এখন তাদের কোন নেতৃত্ব নেই বা নেতা নেই। তারা নিজেরাও এটি থেকে শিখছে না আর মানুষকেও শিখাতে পারে না বা পথ দেখাতে পারে না। পুনরায় এরা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে অথচ তাদের শিক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ ও উৎকর্ষ শিক্ষা যা কিতাবের আকারে তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠার খোদার যে প্রতিশ্রুতি ছিল আর কিয়ামত পর্যন্ত এমন হওয়া অব্যাহত থাকার কথা সে কারণে আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে পাঠিয়েছেন যিনি পুনরায় এক জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রকার কুরবানীর অঙ্গীকার নিয়েছেন।

তাই প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো এটিকে অনুধাবন করার জন্য সূরা জুমুআয় আখারীনদের ওপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে সেই দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, খোদার অনুগ্রহরাজির মূল্যায়ন করা, বয়আতের অঙ্গীকার পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যারা হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর উদ্দেশ্যকে বুঝে এবং সেটিকে পূর্ণ করার চেতনা রাখে। আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যারা কাবা শরীফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নকারী হবে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চেষ্টা করা যারা তৌহীদ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ দেই কেবল তবেই আমরা আখারীনদের সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হব যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুনরায় তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীবাসী কাবা শরীফের প্রতি বিনত হবে। আর মানুষকে কাবামুখি করার জন্য প্রথমে নিজে কাবামুখি হয়ে ঝুঁকতে হবে।

সুতরাং আমাদের সবার নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আমাদের বংশধরদেরও এই প্রকৃত ঈদের মর্ম বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং এমনভাবে তাদের তরবীয়্যত করতে হবে যেন তারা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কুরবানীর জন্যও সদা প্রস্তুত থাকে। আমরা যদি কুরবানীর গুরুত্বকে আমাদের বংশধরদের মাঝে বংশ পরম্পরায় জারী বা চলমান না রাখি, আর আমরা নিজেরাই যদি এর গুরুত্ব ভুলে যাই তাহলে আমাদেরকেও এই পুরস্কাররাজি থেকে বঞ্চিত করা হবে।

নিজেদের নামাযের হিফাযত করা প্রয়োজন। এটি শান্তি এবং নিরাপত্তার আবাস। আমরা যদি এই ঘরের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে থাকি তাহলে নিজেদের প্রতিটি কাজ ও কর্মের মাধ্যমে সেই শান্তির প্রসার ও বিস্তারের চেষ্টা করা প্রয়োজন। পারস্পরিক ভালোবাসা এবং প্রীতি বৃদ্ধির জন্য নিজেদের মাঝে যে অহঙ্কার রয়েছে তা বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।

অতএব তরবীয়তের ওপর যদি দৃষ্টি থাকে, আত্মশুদ্ধির প্রতি যদি মনোযোগ থাকে কেবল তবেই আমরা আমাদের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তবলীগের কাজও করতে পারব এবং পৃথিবীকে কাবা শরীফের প্রতি মনোযোগি করতে পারব, নতুবা দৈহিকভাবে কাবামুখি হয়ে দাঁড়ানো এবং সেই দিকে তাকিয়ে বা মুখ করে ইবাদত করা কোন

কাজে আসবে না। যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অবজ্ঞা করে হজ্জ করা হয় তাহলে সেই হজ্জ কোন ফলই দিবে না যতক্ষন পর্যন্ত সত্যিকার ইবাদতের মান প্রতিষ্ঠিত না হয়। তাই আমাদের সবার স্মরণ রাখা উচিত, যদি বাহ্যিক বিষয়ের প্রতিই আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি দিতেন তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল না। আখারীনদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সুসংবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাহ্যিক কাজ বা আমল, বাহ্যিক কুরবানী, হজ্জ এবং বাহ্যত নামায পড়া তো অন্যান্য মুসলমানরাও করছে কিন্তু তারপরও মুসলমানদের সাধারণ বা সার্বজনিন যে অবস্থা তা পতনোন্মুখ আর আজ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে মুসলমানদের উদাহারণ দেয়া হয়। আজ অমুসলমানদের মাঝে ইসলামের ওপর আপত্তি করার ধৃষ্টতা এজন্য সৃষ্টি হয়েছে কেননা মুসলমানরা যদিও কাবামুখি হয়ে নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু এই কাবাঘর নির্মাণের যে উদ্দেশ্য সেটি তারা ভুলে গেছে। কাবাগৃহ শান্তি এবং নিরাপত্তার নিবাস হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল বা গড়া হয়েছিল কিন্তু আজ মুসলমানরাই মুসলমানদের গলা কাটছে। এমনকি গতকাল আরব দেশ সমূহে ঈদের দিন ছিল আর এই ঈদের দিন এক ফিরকার মুসলমান অন্য ফিরকার মুসলমানদের মস্তক উড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের উভয়ই কাবামুখি হয়ে নামায পড়ার দাবি করে, উভয় দলই হজ্জের রীতি-নীতি পালন করে, উভয়ই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ পাঠ করে, কিন্তু তারপরও যখন আমরা এ ধরণের কর্মকাণ্ড দেখি তখন প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি পূর্বের তুলনায় আরো বেশি এর প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যে, সে এই ধরণের কার্যক্রম থেকে কি শিক্ষা নিয়েছে। শুধু মাংস খাওয়ার জন্য ছাগল জবাই করতে হবে নাকি এ বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রেখে করতে হবে যে, হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.) এবং সবচেয়ে বেশি আমাদের অভিভাবক এবং মনীব মহানবী (সা.)-এর কুরবানীর রূহ বা মূল উদ্দেশ্য কি ছিল। তারা এই কুরবানীর মাধ্যমে আমাদের কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। অতএব মহানবী (সা.)-এর কুরবানীর প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, তাঁর আনিত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সমূহ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন বা অবলম্বন করা প্রয়োজন কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের মাধ্যমে এই অঙ্গীকারই আমরা করেছি। এর ওপর আমল বা অনুশীলনই আমাদেরকে গ্রন্থ পাঠকারীর দায়িত্ব পালনকারী বানাবে। আর তবেই আমরা তাদের দলভুক্ত হব যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা পরিশুদ্ধ করেছেন। নিজেদের হৃদয়কে বিধৌত করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে খোদা তা'লার পানে পদচারণা করতে হবে। তখনই আমাদের এবং অন্যদের মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মের খাতিরে অনেক সময় আপন লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, আত্মীয় স্বজনকেও পরিত্যাগ করতে হয়। এই কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও দিতে হয়েছে। কিন্তু যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, এর চেয়ে বেশি কুরবানী মহানবী (সা.) করেছেন। মক্কার প্রতিটি গৃহের সাথেই তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর নবুয়্যতের দাবির পর, তাঁর তৌহীদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পর সবাই তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কোন আত্মীয়তার সম্পর্কের সম্মান তারা করেনি। তখন এমন কোন অন্যায় ছিল না যা তার প্রতি করা হয়নি কিন্তু তিনি একই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে আমি কখনো বিরত হতে পারি না। তোমরা আমাকে যতই লোভ লালসা দেখাও না কেন, এমনকি আমার এক হাতে সূর্য এবং অন্য হাতে চাঁদও যদি রেখে দাও তবুও আমি কাবা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কুরবানী করতে থাকব আর খোদার বাণী প্রচার করতে থাকব। নিঃসন্দেহে কাবা গৃহ নির্মাণের জন্য যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে সেই পাথরের বাহ্যিক কোন মূল্য নেই, তা কেবল পাথরই। কিন্তু এই গৃহের মর্যাদা অনেক উচ্চ মানের কেননা এটি তৌহীদ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন বা প্রতীক।

অতএব মহানবী (সা.) যখন কুরবানীর এই সর্বোত্তম মান প্রতিষ্ঠা করেন তখন তার সাহাবীগণও এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শুধু সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুতই হননি বরং নির্দ্বিধায় কুরবানীও দিয়েছেন। অতএব আমরা যারা আখারীনদের দলভুক্ত, আমাদেরও এসব কুরবানীকে স্মরণ রাখা উচিত। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের সকল আত্মীয় সম্পর্ককে পিছনে রাখতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের ওপর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে এমন প্রাণ উৎসর্গকারী এবং সাহায্যকারী প্রদান করেছেন যারা সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি যারা নতুন বা নবাগত তারাও এই কুরবানীর স্বাদ গ্রহণ করে। গতকালই আমি আল-ফযলে বর্ণিত একজন আরব আহমদীর আহমদীয়াত গ্রহণের কথা পড়ছিলাম। আহমদী হওয়ার কারণে তার পিতা-মাতা তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তাকে বয়কট করা হয়েছে। তাকে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে। সেনাবাহীনিতে ছিলেন, সেখানে তার কোর্ট মার্শাল হয় এবং অনেক কঠোর ব্যবহার করা হয়। তার মা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি তার ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এ ধরণের উপমা বা দৃষ্টান্ত দু'একটি নয় বরং শত শত, হাজার হাজার রয়েছে। অতএব যতক্ষন পর্যন্ত আমরা কুরবানীর এই মানে প্রতিষ্ঠিত থাকব ততক্ষণ সত্যিকার অর্থে কাবা গৃহ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হব। এসব কুরবানীকে জীবিত রাখার মাধ্যমেই সত্যিকার ঈদ উদযাপন করা যেতে পারে।

অতএব এই বিষয়টি আমাদের সবার স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের বংশধরদেরও এই প্রকৃত ঈদের মর্ম বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং এমনভাবে তাদের তরবীয়্যত করতে হবে যেন তারা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কুরবানীর জন্যও সদা প্রস্তুত থাকে। আমরা যদি কুরবানীর গুরুত্বকে আমাদের বংশধরদের মাঝে বংশ পরম্পরায় জারী বা চলমান না রাখি, আর আমরা নিজেরাই যদি এর গুরুত্ব ভুলে যাই তাহলে আমাদেরকেও এই পুরস্কাররাজি থেকে বঞ্চিত করা হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন তার পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনরা পরিত্যাগ করেন তখন তিনি কি একা পড়ে গিয়েছিলেন? না, তিনি একা হয়ে যান নি বরং আল্লাহ্ তা'লা তাকে এত বেশি সন্তান সন্ততি দিয়েছেন যারা আকাশের তারকার মত গণনাতীত। একইভাবে মহানবী (সা.) কি একা হয়ে পড়েছিলেন? না, বরং তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এমন সব নিষ্ঠাবান, প্রেমিক এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারকারী সাহাবী দান করেছিলেন যারা কেবল আকাশের তারকার ন্যায় ব্যাপক বা অজস্র সংখ্যায় ছিলেন না বরং তাদের হৃদয় তৌহীদের আলোয় এমনভাবে দিপ্তীমান ছিল যে, পৃথিবীর একটি বড় অংশ তাদের আলোয় আলোকিত হয়েছে। তারা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই এই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন।

অতএব আজ আমাদের এই গুরুত্বকে

অনুধাবন করা প্রয়োজন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, কুরবানীর ঈদ থেকে আমাদের এই শিক্ষা নেয়া উচিত যে, নিজেদের সন্তান সন্ততিকে কুরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এ কারণেই তিনি নিজের প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, না, ইসমাঈলকে নয় বরং দুম্বা জবাই কর। এখন দুম্বা কখনো মানুষের প্রাণের বিনিময় হতে পারে না। আর এটি এমন কোন মূল্যবান জিনিসও নয় যা তার পুত্রের বিনিময় হতে পারে। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে দুম্বা তো একটি সামান্য বিষয় ছিল মাত্র কেননা তার কাছে পশুর পাল ছিল। তিনি অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। যে ব্যক্তি মেহমানের আগমন উপলক্ষ্যে তাৎক্ষনিকভাবে একটি বাছুর জবাই করতে পারে তার জন্য এক দুম্বা জবাই করা তো সামান্য বিষয়।

অতএব এর অর্থ হলো আমরা এবং আমাদের সন্তান সন্ততিরা যেন দুম্বা না হই বরং আমরা যেন নিজেদের নফস বা প্রবৃত্তির দুম্বাকে জবাই করি। কেবল জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা যেন সন্তান সন্ততির তরবীয়ত না করি, শুধু তাদের পানাহারের প্রতিই যেন আমাদের দৃষ্টি না থাকে, তাদেরকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করাই যেন আমাদের কাজ না হয় বরং তাদের মাঝে আমরা যেন মানবতা সৃষ্টি করি। সন্তানদের এত আদর সোহাগ করবেন না যার ফলে তারা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের মাঝে মনুষ্যত্বই থাকবে না, আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি তাদের মনোযোগ থাকবে না এবং তারা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে না। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দুম্বা জবাই করতে বলে আল্লাহ্ তা'লা এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, নিজ সন্তানদের মাঝ থেকে দুম্বার স্বভাব যদি তোমরা দূর কর তাহলে তারা পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হবে। আর যতদিন এই স্বভাব অবশিষ্ট থাকবে ততদিন তারা পুরস্কার পাবে এবং নবুয়্যত তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই মূল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রাখতে হবে। নিজ সন্তান সন্ততির জাগতিক স্বাস্থ্য এবং জাগতিক উন্নতির প্রতিই যেন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ না হয় যে, এর ফলে আমাদের পার্থিব লাভ হবে বা জাগতিক লাভ হবে, বরং তাদের তরবীয়ত করা, তাদের মাঝে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার উপলব্ধি সৃষ্টি করা, তাদের নৈতিকতা ও আচার ব্যবহারের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং তাদের মাঝে তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার স্পৃহা সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন, এটিই আমাদের দায়িত্ব। আর এটি তখনই হতে পারে যখন আমরা স্বয়ং এসব বিষয়ের অনুশীলন করব বা এর ওপর আমল করব। আর যখন এমনটি করা হবে তখনই আমরা আখারীনদের সেই জামা'তভুক্ত হব যারা কাবা গৃহ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হবে এবং হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানী সমূহকে স্মরণে রেখে নিজেদের ঈদ উদযাপন করবে। এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাকেও ব্যাপক সংখ্যায় জামা'ত ছড়িয়ে পড়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'উরিহুকা ওয়া লা উজিহুকা ওয়া উখরিজু মিনকা কাউমান'। অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রশান্তি দান করব, আর তোমার নাম নিশ্চিহ্ন হতে দিব না এবং তোমা হতে এক বিশাল জাতি সৃষ্টি করব। তিনি বলেন, এর সাথেই আমার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক ঘটে যে, এর অর্থ হলো যেভাবে আমি ইবরাহীমকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলাম।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমন মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় দান করবেন যারা হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীকেও স্মরণ রাখবেন এবং তৌহীদের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, তৌহীদের প্রচারকারী হবেন আর এর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করবেন না। তারা নিজেদের নফস বা প্রবৃত্তিকে দুম্বা বানাবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধের ওপর আমল করার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। কেবল আর কেবলমাত্র জাগতিকতা বা পার্থিবতা অর্জনই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হবে না বরং তারা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী হবেন। কিন্তু আমাদের মাঝেও প্রত্যেকের এই চেষ্টা করা উচিত যেন আমরাও সেসব লোকের দলভুক্ত হই যারা এই উদ্দেশ্যকে অর্জনকারী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন দোয়া করা হবে। ধর্মের খাতিরে যারা বিপদাপদে জর্জরিত তাদের জন্যও দোয়া করবেন। যারা খোদার রাস্তায় বন্দী আছেন তাদের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। সেই সাথে শহীদ, যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের বংশধরদের মাঝে নেকী বা পুণ্যের ধারা বহাল রাখুন। নিজেদের এবং নিজেদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যও দোয়া করুন যেন তারা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সর্বদা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাদের মাধ্যমে সেই কাজ করান যার তিনি ইচ্ছা করেন। যারা আর্থিক কুরবানী করেন তাদের জন্যও দোয়া করুন। পুরো উম্মতে মুসলেমাহ্‌র জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিন তারা যেন পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হয়, তারা যেন যুলুম নির্যাতন এবং সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত হয়, যুগ ইমামের মান্যকারী ও অনুসরনকারী হয়, কাবা গৃহ যা তৌহীদ এবং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালকারী হয়। মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং মুসলমান প্রজাগণও যেন পরস্পরের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ইসলামের এই অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সবাইকে দেখানোর তৌফিক দিন এবং ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোরও তৌফিক দান করুন। আর পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যেন এক খোদার ইবাদতকারীতে পরিণত হয়।

হজ্জের সময় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে কবলিত হয়ে শত শত মানুষ ইন্তেকাল করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন। এই দুর্ঘটনার মাধ্যমে অনেক নিষ্পাপ প্রাণ ঝরে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

*** খুতবা সানীয়া ও দোয়া ***

এই ঈদ সবার জন্য মোবারক হোক। ঈদ মোবারক। জুমুআর দিন ঈদ হলে যদিও এই অনুমতি আছে যে, জুমুআ না পড়ে যোহর পড়া হয়, কিন্তু আমরা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জুমুআ পড়ব।

ভাষান্তর: **মওলানা মুবারিজ আহমদ সানী**

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২৫তম কিস্তি)

এখন রইল, কারও পক্ষে নিজেকে কোনো নবীর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হিসাবে নিরূপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি-না। এ বিষয়ে জানা আবশ্যক, আপনারা এ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনুধাবন করতে পারবেন, দুনিয়াতে যত নবী প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা সবাই প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন মানুষ যাতে তাঁদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হবার জন্য সচেষ্ট হয়। আমরা যদি তাঁদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিপন্ন হতে না পারি বরং এরূপ খেয়াল করাতে মানুষ যদি কাফির ও মুল্‌হিদ হয়ে যায় তাহলে এমতাবস্থায় নবীগণের আগমন বৃথা এবং তাদের প্রতি আমাদের ঈমান আনাও বৃথা (সাব্যস্ত হয়)। কুরআন করীম পরিষ্কার ভাষায় এরই হেদায়াত (নির্দেশনা) দান করে এবং উম্মুল-কিতাব সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে 'মসীল' তথা প্রতিচ্ছবি ও সদৃশে পরিণত হবার আশ্বাস দেয়। আর আল্লাহ্ আমাদের তাকিদ করেন, 'পাঁচবেলা আমার সমীপে দন্ডায়মান হয়ে তোমরা নিজেদের নামাযে আমার কাছে এ দোয়া প্রার্থনা করো ঃ

('ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল্-মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহিম') অর্থাৎ হে আমাদের 'রহমান ও রহীম' খোদা! তুমি আমাদের এমন হিদায়াত দান কর, যাতে আমরা 'সফিউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র পবিত্রতার প্রতীক) আদম (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। 'নবীউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নবী) শিসের প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। 'আদমে সানি'(দ্বিতীয় আদম) নূহ্ (আ.)-এর প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। 'কলীমুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র সাথে বহুল বাক্যালাপে ভূষিত) মূসা (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই ও 'রুহুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র ওহীর পূর্ণতার প্রতীক) ঈসা (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই এবং 'হাবীবুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র পরম প্রিয় বন্ধু) মহানবী আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। আর দুনিয়াজুড়ে সকল সিদ্দীক ও শহীদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই।

এখন আমাদের উলামা যারা 'মসীল' তথা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবীকে 'কুফর ও ইল্‌হাদ' বলে মনে করেন, আর যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র ইলহাম তথা ঐশীবাণীর মাধ্যমে সম্ভাব্য ও সুলভ্য এই পদমর্যাদা লাভের সুসংবাদ দান করা হয়েছে তাকে যাঁরা মুল্‌হিদ, কাফির ও জাহান্নামী আখ্যা দেন। আপনারা একটু ভেবে-চিন্তে বলুন, সূরা ফাতিহার মহতী এ আয়াতের যদি সেই অর্থ না হয়ে থাকে যা আমি পেশ করেছি তাহলে এর অন্য অর্থটি কী? এ অর্থ যদি এর প্রকৃত অর্থ না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' কেন বলেন?

'কুল্ ইন্‌কুন্‌তুম তুহিব্‌বূনাল্লাহা ফাত্‌তাবিউনি ইউহ্‌বিব্‌কুমুল্লাহু' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২) অর্থাৎ তাদের বলে দাও তোমরা যদি খোদা তা'লাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর যাতে খোদা তা'লাও তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের তিনি নিজ ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে নেন।' এখন চিন্তা করা উচিত, মানুষ যখন একজন 'মাহবুব' বা প্রিয়ভাজনের অনুসরণ করার কারণে নিজেও প্রিয়ভাজনে পরিণত হলো, তখন সে কি সেই মাহবুবের সদৃশই হলো? না-কি অ-সদৃশ থাকলো?

আফসোস, আমাদের বিদ্বেষপরায়ণ বিরুদ্ধবাদীরা একটুও চিন্তা করেন না যে, 'তালেবে-মৌলা' তথা প্রিয় প্রভু আল্লাহ্‌র (সান্নিধ্য-) অন্বেষী ব্যক্তির জন্য এটিই তো উত্তম ও উৎকৃষ্ট সেই আকাঙ্ক্ষা যা তাকে মুজাহাদা ও সাধনার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ দান করে। আর এটিই তো এক শক্তিশালী ইঞ্জিন স্বরূপ যা তাক্‌ওয়া-তাহারত (খোদাভীতি ও পবিত্রতা), আন্তরিক নিষ্ঠা ও অবিচল দৃঢ়তার উন্নত মার্গসমূহের দিকে আকর্ষণ করে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটিই তো পিপাসাবর্ধক সেই আগুন বিশেষ, যার দরুন 'সালিক' তথা আল্লাহ্‌র দিকে পথচারীর 'জাহির ও বাতিন' (ভিতর ও বাহির) উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। যদি এ লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নৈরাশ্য সৃষ্টি করা হয় তাহলে সেই প্রকৃত পরমপ্রিয় আল্লাহ্‌র সত্যিকার অন্বেষী ব্যক্তিগণ তো জীবিত থাকতেই মারা যাবেন। আজ পর্যন্ত যত সংখ্যক বড় বড় সিদ্ধি লাভকারী বুযুর্গ সূফী গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যকার একজনেরও এ বিষয়ে মতবিরোধ বা দ্বি-মত নেই যে,

এই মহতী দ্বীনে-ইসলামে নবীগণের 'মসীল' তথা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হবার পথ খোলা রয়েছে। যেমন, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রূহানী ও রাব্বানী উলামার জন্য এ সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ "উলামাউ উম্মাতি কা-আম্বিয়াই বনী ইসরাঈল" (অর্থাৎ 'আমার উম্মতের উলামা তথা প্রকৃত জ্ঞানীগুণীগণ হবে বনী ইসরাঈলী নবীগণের তুল্য' –অনুবাদক)।

একে কেন্দ্র করেই হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (ক্বুদ্দিসা সিররুহু) বর্ণিত নিম্নরূপ পবিত্র বাক্যাবলী রয়েছে– যা 'তাযকিরাতুল-আওলিয়া' গ্রন্থে হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য প্রামাণ্য ও আস্থাভাজন পুস্তকেও লিখা রয়েছে ঃ "আমি আদম। আমিই শিস। আমি নূহ্। আমিই ইবরাহীম। আমিই মূসা। আমিই ঈসা। আমিই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা ইখ্‌ওয়ানিহি আজ্‌মায়ীন)।"

যদিও উল্লিখিত বাক্যসমূহের কারণে হযরত বায়েজিদ বুস্তামীকে (রহ.) সত্তর বার কাফির আখ্যা দিয়ে তাঁর নিজ শহর বুস্তাম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং উল্লিখিত মিঞা আব্দুর রহমানের মতো তারাও বায়েজিদ (রহ.)-কে কাফির ও মুল্‌হিদ নামে আখ্যায়িত করায় ভীষণ সীমালঙ্ঘন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারাই আবার তাঁর প্রতি সীমাতীত বিশ্বাসী ও তাঁর অতিভক্ত অনুগামী হয়ে যায় এবং নিজেদের শরীয়ত পরিপন্থী কথাবর্তারও অনুতাপসূচক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে।

অনুরূপভাবে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জীলানী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রণীত 'ফতুহুল-গাইব' পুস্তকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে মানুষ প্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনামুক্ত ও আত্মোত্যাগ এবং 'ফানা-ফিল্লাহ্' (তথা আল্লাহ্‌তে আত্মবিলীন) হওয়া অবস্থায় সকল নবী-রসূলের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বরং তাদেরই ছাঁচে রূপান্তরিত হয়।

আর এ অধমের বন্ধু মৌলবী আবু সাইদ মোহাম্মদ হুসায়ন বাটালবীও তাঁর প্রকাশিত 'ইশাআতুস্-সুন্নাহ' পত্রিকার ৭ম খন্ডের ৭ম সংখ্যায় সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার বিষয়টির শরীয়ত মোতাবেক বৈধ ও সম্ভব হওয়ার সম্পর্কে ও সপক্ষে পর্যাপ্তভবে অনেক কিছু লিখেছেন। 'বারাহীনে-আহমদীয়া' গ্রন্থে এ অধমের পক্ষ থেকে, তার প্রতিশ্রুত সদৃশ হওয়া সম্পর্কিত দাবী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এ বিষয়টিও বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে যে এ প্রসঙ্গে কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসে এ অধম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ সংবাদ দেয়া হয়েছে। তবে শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব যদিও উল্লেখিত বিষয়ে খোলাখুলি কোন সমর্থন জ্ঞাপন না করলেও এর সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কেননা বারাহীন গ্রন্থের 'রিভিউ' (পর্যালোচনা) লেখার অবস্থান থেকে এ প্রসঙ্গে তাঁর পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা এবং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান স্বরূপ কিছুই না বলা এরই জোরালো প্রমাণ যে তিনি এ বিষয়েরও বিরোধী নন যে এ অধম রূপক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা 'বারাহীন'গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছিল যে এ অধম আধ্যাত্মিকভাবে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, আল্লাহ্ ও রসূল পূর্ব থেকে যার সংবাদ দিয়ে গেছেন। তবে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে (কোনো কোনো চিহ্নসহ) অন্য কোনো প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ও ভবিষ্যতে কোনো সময়ে আবির্ভূত হতে পারেন– এ বিষয়ে আগেও অস্বীকার করা হয়নি এবং এখনও অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তখনকার এবং এখনকার বর্ণনার মাঝে এটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, সংক্ষেপে ইলহাম হওয়ার কারণে এবং সবদিক না জানার দরুন পূর্বে সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা হয়েছিল এবং এখন বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। যাই হোক, স্বনামধন্য মৌলবী সাহেব এ অধমের 'মসীহ্ সদৃশ' হওয়ার বিষয়ে সাম্ভাব্য প্রমাণ অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। আর তাই এক জায়গায় তিনি হযরত মহিউদ্দিন-ইবনে-আরবীর বক্তব্য এ বিষয়ের সমর্থনের উদ্দেশ্যে 'ফতুহাতে-মক্কীয়া'-এর ২২৩ তম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করেন। সেই উদ্ধৃতিটি অনুবাদসহ নিম্নরূপ ঃ

غاية الوصلة ان يكون الشيء عين ما ظهر ولا يعرف كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عانق ابن حزم المحدث فغاب احدهما في الآخر فلم نرالا واحداً وهو رسول الله صلعم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد (فتوحات مكية)

অর্থাৎ, "চূড়ান্ত পর্যায়ের 'আত্মিক সংযুক্তি বা সম্মিলন' হলো, একটি জিনিসের হুবহু আরেকটি ঐ জিনিসে পরিণত হওয়া যেটিতে তা প্রকাশিত ও দৃশ্যমান হওয়ায় স্বয়ং সেটিকে দেখা যায় না। যেমন, আমি স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখলাম তিনি মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মদ-বিন-হায্‌মকে আলিঙ্গন করেছেন। এতে করে একজন ছাড়া অন্য কাউকে দেখা গেল না।" এরপর স্বনামধন্য মৌলবী সাহেব তাঁর কথার সমর্থনে নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত 'আত্‌হাফুন্-নুবালা' পুস্তক থেকে একটি রুবায়ী অনুবাদসহ উদ্ধৃত করেন। সেটি নিম্নরূপ ঃ

অর্থাৎ আমার কুৎসাকারী (হিংসুক) রাতে আমার কাছে আমার প্রেমাস্পদের আসার কথা টের পেয়ে সে আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করতে লাগলো। অতএব আমি আমার প্রিয়কে গলায় জড়ালাম। এরপর সে হিংসুক আসলো এবং আমাকে একজন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না।" এরপর তিনি নিম্নরূপ ফার্সী পংক্তি দু'টি উদ্ধৃত করেন ঃ

("জায্‌বায়ে শওক বাহাদ্দেস্‌ত মিয়ানে মান ও তু।

কেহ্ রাক্বীব আমদ ও নাশনাখ্‌ত নিশানে মান ও তু ॥")

(অর্থঃ 'আমাদের দু'জনার মাঝে আবেগ-অনুভূতি যখন চরম মার্গে উপনীত তখন হিংসুক কুৎসাকারী এলো এবং তার দেখার মতো আমাদের মাঝে তখন দূরত্ব বা দ্বিত্বের কোনো চিহ্নই ছিল না।' –অনুবাদক)

এরপর তিনি দোয়াযুক্ত এ বাক্যটি লেখেন ঃ

"রাযাক্বানাল্লাহু মিন হাযাল ইত্তাহাদি ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ্।"

অর্থাৎ 'খোদা তা'লা আমাদেরও অনুরূপ ঐক্যবন্ধন ইহকাল ও পরকালে দান করুন।'

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

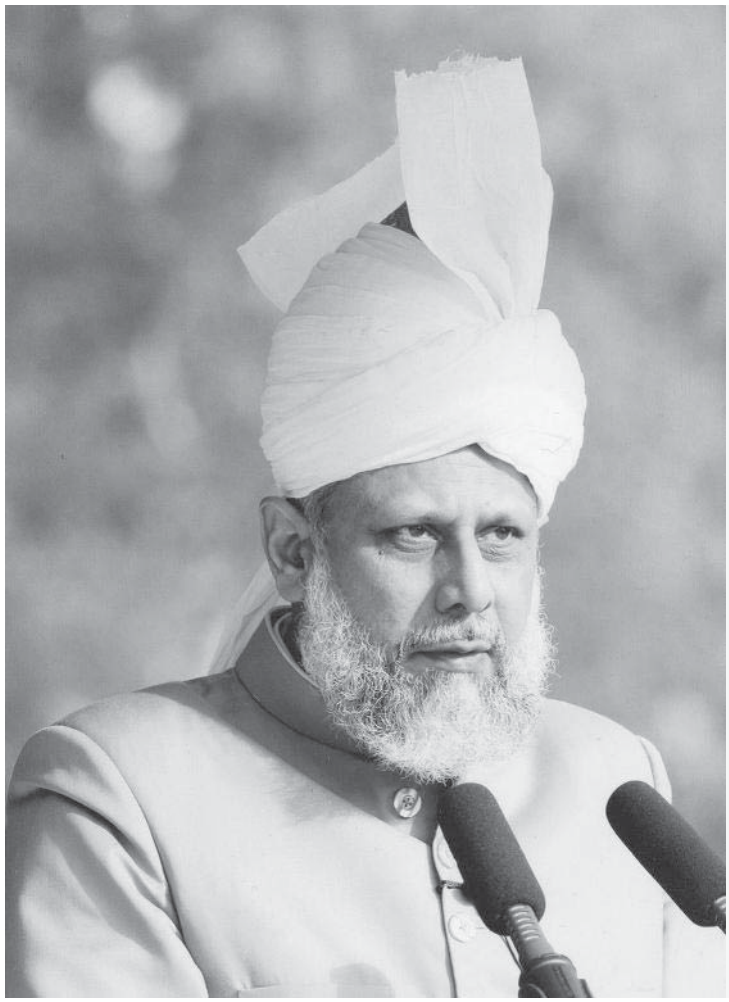

জুমুআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যাপিত জীবনের আলোকে বিভিন্ন মূল্যবান উপদেশ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কায়িক শ্রম এবং কষ্টসাধ্য কাজের অভ্যাস, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য তাঁর রীতি কি ছিল এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তিনি মোটেই অলস ছিলেন না বরং অত্যন্ত পরিশ্রমী এক মানুষ ছিলেন, আর নির্জনতা প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রম করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, সফরে যেতে হলে সফরের নিমিত্তে নির্ধারিত ঘোড়া চাকরের সাথে আগেই পাঠিয়ে দিতেন আর পায়ে হেঁটে প্রায় বিশ/পঁচিশ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছতেন, বরং প্রায়শঃ তিনি পায়ে হেঁটেই সফর করতেন, বাহনে কমই বসতেন। পায়ে হাঁটার এই অভ্যাস তাঁর জীবনের শেষ অংশেও ছিল। ৭০ বছর অতিক্রান্ত বয়সেও, যখন তিনি বেশ কিছু রোগে আক্রান্ত ছিলেন, প্রায় সময় দৈনন্দিন বায়ু সেবনের জন্য যখন বাহিরে যেতেন তখন প্রতিদিন চার/পাঁচ মাইল পর্যন্ত ঘুরে আসতেন, এমনকি অনেক সময় সাত মাইলও পায়ে হাঁটতেন। আর প্রৌঢ়ত্বের পূর্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়েতিনি (রা.) বলেন যে, অনেক সময় ফজরের নামাযের পূর্বেই ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে যেতেন, আর বাটালা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর যা কিনা একই সড়ক পথে কাদিয়ান থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম, সেখানে পৌঁছানোর পর ফজরের নামাযের সময় হতো।

অতএব এই হলো আমাদের জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে ওয়াকেফে যিন্দেগীদের জন্য যাদের ওপর জামাতের সেবার দায়িত্ব রয়েছে,যাদের মাঝে প্রথম সারিতে আসবেন মুবাল্লিগ-মুরুব্বীরা। আপনারা স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ব্যায়াম বা রীতিমত ভ্রমণের অভ্যাস করুন। সময়ের স্বল্পতার কারণে বা অন্য যে কোন কারণে যদি ভ্রমণ করতে না পারেন তাহলে কিছুটা হলেও ব্যয়ামের জন্য সময় বের করা উচিত। কোন কোন মুরুব্বী যারা এখনও যৌবনকাল অতিক্রম করছেন তাদের দেহ দেখে বোঝা যায় যে, তারা ব্যায়াম করে না। জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে যে, ব্যয়াম করতাম, কিছুকাল থেকে ব্যায়াম ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের মুবাল্লিগ বা মুরুব্বীদের

ওপর যতবড় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তার কারণে দেহ সুঠাম এবং সুস্বাস্থ্যবান রাখার জন্য তাদের ব্যায়ামের প্রতি রীতিমত দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের বহির্বিশ্বের জামেয়ার মুরুব্বী/মুবাল্লিগরা পড়ালেখা শেষ করে প্রশিক্ষণের জন্য রাবওয়ায়ও গিয়ে থাকেন, আর সেখানে তাদের মেডিক্যাল চেকআপও হয়ে থাকে। ডাক্তার নূরী সাহেব যিনি সেখানে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, তিনি লিখেছেন যে, মাশাআল্লাহ্ সকল অর্থে এরা অনেক ভালো মুরুব্বী কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিলেন যাদের ওজন বিপদজ্জনক সীমা পর্যন্ত বেশি। তাই এদিকে তাদের মনোযোগ দেয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তো মানুষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি অমনোযোগের শিকার হয়ে যায়।

প্রধানত আমাদের মুরুব্বীদের এবং ওয়াকেফে যিন্দেগীদের কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম অবশ্যই করা উচিত। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যে অস্বাস্থ্যকর খাবারের ছড়াছড়ি। তারা নিজেরা এটিকে জাঙ্ক ফুড নাম দিয়ে থাকে। এই খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। সুতরাং আশা করি আপনারা এই বিষয়েও যত্নবান হবেন। যদি একা থাকেন তাহলেও এতটা সময় তো পাওয়া যায়ই যে, যেখানে মিশন হাউস রয়েছে, পরিবার সাথে না থাকলেও কিছুটা খাবার রান্না করার জ্ঞান একজন মুরুব্বীর অবশ্যই থাকা উচিত। যাহোক এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমি শুধু আপনাদেরই উপদেশ দিচ্ছি না বরং আমি নিজেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সাইকেল, এক্সারসাইজ মেশিন এবং অন্যান্য মেশিনে ব্যায়াম করে থাকি। এখন পর্যন্ত তো আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দিচ্ছেন। যাহোক আমাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুরুব্বী চাই। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই কথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, তারা যেন নিজেদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন না হয়, যেন নিজেদের দায়িত্ব তারা সুচারুরূপে পালন করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আজকাল লাউড স্পিকার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের আওয়াজ সর্বত্র পৌঁছিয়ে থাকি, আর এ কারণে আমাদের অনেকেই উচ্চস্বরে কথা বলার অভ্যাস রাখে না বা পারলেও সামান্য। বিশেষ করে মুরুব্বী/মুবাল্লিগ যারা বক্তৃতা করে আর যখন কর্মক্ষেত্রে যায় বা তবলীগ করতে হয় তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের উচ্চস্বরে কথা বলার অভ্যাস করা উচিত। অনেক সময় মাইক থাকে না, বিশেষ করে দরিদ্র বিশ্বে এমনটি হয়। অতীতে আওয়াজ পৌঁছানোর কোন মাধ্যম ছিল না। গণ জমায়েতে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হতো বা কঠিন ছিল। মানুষ উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাসও রপ্ত করতো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণত খুব ক্ষীণ কণ্ঠে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলতেন। কিন্তু প্রয়োজনে পৃথিবীকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হলে তখন তার অবস্থা কেমন হতো তার চিত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এভাবে অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন লাহোরে বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হন তখন লাহোরের সবচেয়ে বৃহৎ হলে তাঁর বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে জনসমুদ্র ছিল আর মানুষের এত ভিড় ছিল যে, দরজা খুলে দেয়া হয় বরং বাহিরে তাবু লাগানো হয়, কিন্তু তবুও শ্রোতা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। বক্তৃতার প্রথম দিকে রীতি অনুযায়ী তাঁর আওয়াজ কিছুটা ক্ষীণ ছিল, কোন কোন মানুষ তখন হৈ-চৈও করে, কিন্তু পরে যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে শিঙ্গা বাজানো হচ্ছে। আর মানুষ হতভম্ব ও নির্বাক হয়ে বসেছিল। তাই ধর্মের খিদমতের জন্য আওয়াজ উঁচুও করতে হয়। যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের এই দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত।

অনেক সময় কিছু মানুষ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুঃশ্চিন্তা ব্যক্ত করে যে, আমাদের পুণ্যের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। তাদের জন্য এটি বড়ই চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো কথা যে, মানুষ আত্মবিশ্লেষণ করে। এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা একটি ভালো কথা যে, আমার মাঝে পুণ্যের ঘাটতির যে অবস্থা রয়েছে বা পুণ্যকর্ম ও ইবাদতে পূর্বে যেই আগ্রহ ছিল সেই ক্ষেত্রে ঘাটতি হলে আত্মজিজ্ঞাসা করা যে, এমনটি কেন হলো আর এই চিন্তা থাকা যে, এই অবস্থা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয় আর তার চিকিৎসার কথা চিন্তা করা উচিত। এমনটি করা আসলে ভালো কথা। এটি ভালো মনোভাব। কিন্তু অনেক সময় এটিও হয় যে, নেকীর ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা ক্রমাগতভাবে ঘটতে থাকে। একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন সাহাবী আসেন। তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। আপনার অধিবেশনে বা বৈঠকে যখন বসি তখন আমার অবস্থা ভিন্ন হয় আর আপনার বৈঠক থেকে যখন চলে যাই বা প্রস্থান করি তখন আমার অবস্থা ভিন্ন হয়। অর্থাৎ আপনার সাহচর্যে আমার পুণ্য এবং হৃদয়ের পবিত্রতা যা হয় তা পরে আর থাকে না। মহানবী (সা.) বলেন, এটিই তো মু'মিন হওয়ার লক্ষণ, তুমি মুনাফিক নও। রসূলে করীম (সা.)-এর সাহচর্যের যে পবিত্র প্রভাব ছিল, এটি জানা কথা যে, তাঁর (সা.) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সাহচর্যের সেই প্রভাব তো পড়ারই ছিলএবং প্রভাব বিস্তার করেছেও কেননা তাঁর কাছে যারা বসতো তারা পবিত্র হৃদয় নিয়েই বসতো এবং শিখার জন্য বসতো আর খোদার সাথে সম্পর্কের মান উন্নয়নের জন্য বসতো।

এরপর বাহিরে গিয়ে এতে কিছুটা ঘাটতিও সৃষ্টি হতো। যাহোক সেই সাহাবীর হৃদয়ে খোদাভীতি, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। তাই তার চিন্তা হয় যে, পুণ্যে ঘাটতির এই অবস্থা কোথাও দীর্ঘ না হয়ে যায়, আর কোথাও তা আমাকে ধর্ম থেকে দূরে না ঠেলে দেয়, কোথাও কপটতা বা মুনাফিকাত না আমার মাঝে দানা বাধে। তো এই ছিল সাহাবীদের চিন্তা। এই সচেতনতা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষ দোয়া এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দিবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে, কোন কোন শিশুর স্বাস্থ্য সচরাচর মায়েদের সন্দেহের কারণে ভালো থাকে। বাচ্চার সামান্য কষ্ট হলেই মা সেটিকে চরম কষ্ট জ্ঞান করে আর চিন্তা করে যে, আল্লাহ্‌ই জানে কি হয়েছে। আর পুরো সচেতনতার সাথে তার চিকিৎসা করায়। আর রোগের ক্রনিক আকার ধারণ করা থেকে বাচ্চা রেহাই পায়। কিন্তু কোন কোন মা এমন হয়ে থাকে যে, বাচ্চা যে অসুস্থ্য এই ধারণাই তাদের এত দেরীতে হয় যখন রোগ ক্রনিক রূপ ধারণ করে আর চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, তো মায়ের সন্দেহও বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নিজের বিষয়ে এমন সন্দেহ যে, পুণ্য করার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে না তো বা আমি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না তো, এমন সন্দেহ উপকারীই হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্

মাওউদ (রা.) বলেন যে, এভাবে মানুষ বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর নিজেকে সেই আক্রমণ থেকে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যায়।

তো প্রকৃত অর্থে তারাই পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামি আর খোদার নির্দেশের অধীনস্ত হয়ে থাকে যারা মায়ের মতো সবসময় সচেতন থাকে যে, তাদের নামাযে বা দোয়ায় ঘাটতি তাদের কোন দুর্বলতা এবং পাপের ফলাফল নয় তো। আর এর ফলে কোথাও তারা এমন আধ্যাত্মিক রোগী না হয়ে যায় যার রোগ হবে দুরারোগ্য এবং যে রোগ অনেকটা ছড়িয়ে পড়বে। তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তো এমন সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে যখন তাদের দুশ্চিন্তা হতো তখন তারা তাঁর (সা.) সাহচর্যে গিয়ে ঠাই নিতেন। আর রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে নিজেদের চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু আমাদেরও এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে নিজেদের ইবাদত, দোয়া এবং ইস্তেগফারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলোকে স্থায়ীভাবে অবলম্বন করে থাকা উচিত আর এভাবে সব সময় চিকিৎসা করে যাওয়া উচিত। আমাদেরও যদি সন্দেহ হয় তাহলেসেই সন্দেহ ভ্রুক্ষেপহীনতার চেয়ে উত্তম কেননা অনেক সময় ভ্রুক্ষেপহীনতা মানুষকে খোদা তা'লা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা ধীরে ধীরে ধর্ম থেকেও দূরে চলে যাই এবং দুরারোগ্য আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাই। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুগভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, সুখ বা আনন্দ ও বেদনা অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন কোন ঘরে যদি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সেই বিয়ের আনন্দ উল্লাসের জন্য ঋন করতে হলেও মানুষ ঋন করে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর তার আত্মীয় স্বজনরাও সেই আনন্দের অংশ হয়ে যায়। কিন্তু যাদের সেই আনন্দের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না তাদের জন্য সেই ব্যক্তির আনন্দিত হওয়া বা সেই পরিবারের মানুষের আনন্দিত হওয়া বা নিকট আত্মীয়ের আনন্দ উল্লাস করা আর এর জন্য কষ্ট করা বা ঋণ নেয়া কোন অর্থই রাখে না। তাদের এর সাথে কিইবা সম্পর্ক যে, কে আনন্দ উল্লাস করলো বা করলো না অথবা ঋণ নিয়ে আনন্দ উল্লাস করলো কি করলো না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি তার বংশের ভরণপোষণকারী হয়ে থাকে আর সে যদি মারা যায় তাহলে তার ঘরে এক প্রকার শোক ছেয়ে যায় বা ঘরের মানুষ শোকে জর্জরিত থাকে। কিন্তু যাদের তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের জন্য তার মৃত্যু হওয়া কোন অর্থ রাখে না। সহস্র সহস্র মানুষ প্রতিদিন মারা যায়, অনেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এবং মৃত্যুর সংবাদ আসে কিন্তু যাদেরকে আমরা জানি না তাদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও সেই মৃত্যুকে মানুষ অনুভব করে না। কিন্তু কারো কোন নিকটাত্মীয়ের যদি ইন্তেকাল হয় তাহলে মানুষ তা গভীরভাবে অনুভব করে। আবার কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা অন্যদের জন্য গভীর কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, নিষ্ঠুর ডাকাত বা সন্ত্রাসী হয়ে থাকে। এদের মৃত্যুতে এক শ্রেণীর মানুষের বেদনার পরিবর্তে আনন্দই হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের নিকটাত্মীয়েরা দুঃখভারাক্রান্তও হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি আবেগ এবং অনুভূতির এক অদ্ভুত জগৎ, এটি নিয়ে ভাবলে অদ্ভুত মানসিক অবস্থা বিরাজ করে। একটি কথা এক জনের জন্য আনন্দের মুহূর্ত এবং প্রশান্তির ক্ষণ হয়ে থাকে আর অন্যের জন্য তা হয়ে থাকে শোক এবং দুঃখের কারণ। অনেকে এমনও হয়ে থাকে যাদের সুখের সাথেও সম্পর্ক থাকে না আর দুঃখের সাথেও নয়। তিনি বলেন, এই বিষয়টি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রীতিমত পত্রিকা পড়তেন। এর মাঝে, আমাদের সেসব লোকদের জন্য যাদের ওপর ধর্মীয় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, শিক্ষনীয় দিক হলো তাদের রীতিমতো পত্রিকা পড়া উচিত আর ছোট ছোট সংবাদও দেখা উচিত। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রীতিমত পত্রিকা পড়তেন। ১৯০৭ সনের কথা, একদিন পত্রিকা পড়তে পড়তে তিনি হঠাৎ আমাকে মাহমুদ বলে ডাক দেন। এই আওয়াজ এমন ছিল যেভাবে তাৎক্ষনিক কোন কাজ করার জন্য কেউ কাউকে ডাকে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে ডাকেন আর তাঁর আওয়াজ এমন ছিল যেন তাৎক্ষনিকভাবে করার মতো কোন কাজের জন্য ডাকছেন। তিনি বলেন, আমার উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আমাকে একটি সংবাদ শুনান, এক ব্যক্তির কথা বলেন যার নাম এখন আমার মনে নেই। তিনি (আ.) বলেন যে, সে মারা গেছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি শুনে আমার হাসি চলে আসে। আমি বললাম যে, এতে আমার কি। হুযূর (আ.) বলেন, তার ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর তুমি বলছো আমার কি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, এর কারণ কি? এর কারণ হলো যার সাথে সম্পর্ক থাকে না তার দুঃখেরও কোন প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে না। অনুরূপভাবে যদি আনন্দের কোন বিষয় হয়ে থাকে তারও কোন প্রভাব পড়ে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই কথা তখন বর্ণনা করেন যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুত্র মিঞাঁ আব্দুস সালাম সাহেবের নিকাহ্ হয়েছিল। নিকাহ্‌র সময় তিনি এই কথা বলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজের আবেগ এবং অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেন যে, আজকে যদি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি কতইনা আনন্দিত হতেন আর দোয়া করতেন। আর এর কল্যাণে অন্যদেরও দোয়ার প্রতি কতইনা প্রেরণা সৃষ্টি হতো। তিনি বলেন যে, এই উপলক্ষ্য এবং এই চিন্তা আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদি কোন প্রিয়জনের কোন আনন্দঘন মুহূর্ত হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যে, কিভাবে আমাদের সেই প্রিয়জন এত ঘনিষ্টজনের জন্য দোয়া করতেন আর আমাদের সারা দেহে আনন্দের এক তরঙ্গ ছুটে যায়।

সুতরাং এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদের জন্য এবং তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত। আনন্দ এবং দুঃখের মুহূর্তে তাদের স্মরণ বা অনুভব করা উচিত আর মোটের ওপর জামাতের সদস্যদের জন্যও আমাদের সুখ-দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত কেননা জামা'ত একই সত্তার নাম, আর এটি আমরা তখনই অনুভব করবো যদি জামাতের প্রতিটি সদস্যের দুঃখ এবং বেদনাকে আমরাও অনুভব করি। এটিই এই জামা'তকে ঐক্য বা একতার সূত্রে গেঁথে দেয়ার কারণ হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর আনুগত্যের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে আমার মনে পড়ে যে, পটিয়ালা নিবাসী আব্দুল হাকীম মুর্তাদ যখন আহমদী

ছিল তখন তিনি তাকে অনেক ভালোবাসতেন, আর তারও উনার সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। সে যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে তখনও সে এটিই লিখেছে যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতে মৌলভী নূরুদ্দীন ছাড়া আর কেউ নেই যে সাহাবীদের আদর্শ হতে পারে, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জামাতে আহমদীয়ার জন্য গর্বের কারণ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, পটিয়ালা নিবাসী আব্দুল হাকীম একটি তফসীরও লিখেছিল যাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে অনেক কিছু সে লিপিবদ্ধ করেছে। আব্দুল হাকীম যখন মুর্তাদ হওয়ার ঘোষণা দেয় তখন আমি দেখেছি যে, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাৎক্ষনিকভাবে তার শিষ্যদের ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, যাও যত দ্রুত সম্ভব আমার পাঠাগার থেকে আব্দুল হাকীমের তফসীরটা বের করে দাও। সে যে তফসীর লিখেছিল তা উনার পাঠাগারে পড়েছিল। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে তা বের করে দাও, কোথাও এমন না হয় যে, এটির কারণে খোদার ক্রোধানল আমার ওপর বর্ষিত হয়। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অথচ তা কুরআনেরই তাফসীর ছিল আর এর বহু আয়াতের তফসীর সেই ব্যক্তি স্বয়ং তাঁর কাছে অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেই লিখেছিল। কিন্তু তার ওপর যেহেতু খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে এবং সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাই তার লিখিত তাফসীরও তিনি তাঁর পাঠাগার থেকে বের করে দেন এবং নিজস্ব রুচী অনুসারে তিনি এটি ভেবেছেন যে, এই বই অন্যান্য বই-এর সাথে একত্রে থেকে সেগুলোর জন্যও নোংরামীর কারণ হবে। তো এই ছিল ধর্মীয় আত্মাভিমান যা নিঃসন্দেহেআমাদের জন্য অনুকরণীয়।

কিছু মানুষ আপত্তি করে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ জামা'তীভাবে কাউকে যদি শাস্তি দেয়া হয় বা কারো বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে সে নিজের সম্পর্কে বলে যে, আমার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা অন্যায়, অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা নেওয়া হয়নি এবং তাকে সমর্থন বা তার সাহায্য করা হয়েছে। এমন আপত্তি করা নতুন কিছু নয়। সকল যুগে এমন আপত্তি করা হয়, আজও মানুষ এমন করে আর পূর্বেও করত। এমন লোকদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে ব্যবস্থাপনার সংশোধনের জন্য চিন্তা-ধারার ঐকতানের একটা গন্ডি থেকে থাকে। একটি মতভেদ বড় হতে পারে কিন্তু তা যদি নৈরাজ্যের কারণ না হয় তাহলে সেই মতভেদ যে পোষণ করে তাকেকোন কোন সময় জামা'তভুক্ত থাকার অনুমতি দেয়া যেতে পারে বা তার জন্য অনুমতি থাকতে পারে, কিন্তু অপর দিকে কোন ব্যক্তির মতভেদ ছোট হলেও তা যদি ফিতনার কারণ হয় তাহলে তাকে জামা'ত থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। তিনি বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে বলে যে, আমি মাত্র শিয়া ধর্ম বা শিয়া মতবাদ থেকে বেরিয়ে আহমদীয়াতে যোগ দিয়েছি আর হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আবুবকর এবং হযরত উমর (রা.) থেকে বড় এবং শ্রেষ্ঠ মনে করি কেননা আমার ওপর শিয়া মতের প্রভাব বেশি। এই বিশ্বাসের বর্তমানে বা এই বিশ্বাস থাকা অবস্থায় আমি আপনার হাতে বয়আত করতে পারি কি না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে লিখেছেন যে, হ্যাঁ, আপনি বয়আত করতে পারেন।

কিন্তু পক্ষান্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার কয়েক ব্যক্তিকে শাস্তি স্বরূপকাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞাপনও প্রচার করেন, কারণ শুধু এটিই ছিল যে, তারা পাঁচ বেলার নামাযে উপস্থিত হতো না, আর কতক এমন ছিল যাদের বৈঠকে হুক্কা পান এবং আজে বাজে কথা বার্তার রীতি ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এখন আমাকে বল যে, হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের চেয়ে শ্রেয় মনে করা আর হুক্কাপান করার মাঝে কোন্‌টি বেশি জঘন্য? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তি এই কথাই বলবে যে, হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের চেয়ে বড় মনে করা বেশি জঘণ্য বা বড় কথা আর হুক্কা পান করা সামন্য বিষয়, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটা বড় মতভেদ পোষণ করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে তাঁর হাতে বয়আতের অনুমতি দেন আর হুক্কা পান এবং হাসি তিরস্কারে মগ্ন থাকার দোষে অন্যজনকে কাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, অথচ স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক নিমন্ত্রণের সময় নিজে এর ব্যবস্থা করেন। তুর্কী দূত হুসেন কামী যখন কাদিয়ান আসে এবং তার ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, আমি তখন ছোট ছিলাম কিন্তু আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, এক বৈঠকে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন যে, এরা সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, যদি এর ব্যবস্থা না করি তাহলে তাদের কষ্ট হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, কোন অসুবিধা নেই, কেননা এটি মদ ইত্যাদির মত নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় নয়। সুতরাং মদের মতো অবৈধতা যে সমস্ত জিনিসের নেই এমন জিনিস ব্যবহারের কারণে এক ব্যক্তিকে তিনি জামা'ত থেকে বহিস্কার করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছিল আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে হযরত আলীকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে বয়আতের অনুমতি দেন। তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে কিছু বিষয় সাময়িক ফিতনা এবং অশান্তির দিক থেকে বড় বা জঘন্য হয়ে থাকে কিন্তু তা হয়ে থাকে তুচ্ছ বিষয়। আর কোন কোন কথা সাময়িক নৈরাজ্যের দিক থেকে সামান্য হয়ে থাকে অথচ প্রকৃত অর্থে তা বড় বা জঘন্য হয়ে থাকে।

তাই সাময়িক ফিতনা বা নৈরাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন কথাকে উপেক্ষা করা হয় এবং ছোট বিষয়ের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা কখনও বিবেক খাটায় নি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপত্তি করা। অনেকেই অন্যদের সম্পর্কে পক্ষে কথা বলে, যারা শাস্তি পায় তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, অথচ এরা জানে না যে, আসল বিষয় কি, আর কোন্ কারণে এই ব্যক্তির শাস্তি হয়েছে। তাই বিনা কারণে নাক গলানো উচিত নয় বা কারো সুপারিশ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, ব্যবস্থাপনা যখন যুক্তিযুক্ত মনে করে তখন খবরা খবর নেয়া হয়, এরপর ক্ষমাও হয়ে যায়। এমন আপত্তিকারী আমি যেভাবে বলেছি আজও রয়েছে যারা কেউ অন্যায় কাজের পর শাস্তি পেলে তাদের সংশোধনের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অপলাপ করে থাকে, একই সাথে আবার এই দাবিও করে যে, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব, কিন্তু তা সত্ত্বেও জামাতের ব্যবস্থাপনার উচিত আমাদেরকে ব্যবস্থাপনার অঙ্গীভূত করা এবং আমাদের ক্ষমা করে দেয়া, আমরা আত্মসংশোধন করব না।

এখানে আমি পুনরায় স্পষ্ট করতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিঃসন্দেহে তুর্কীর দূত সাহেবের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা আনিয়ে দিয়েছেন, যা নিষিদ্ধ নয়, যেভাবে

অন্যান্য হারাম জিনিষ সম্পর্কে লেখা আছে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং হুক্কা পান করা বা তামাক সেবনকে অপছন্দ করতেন এবং কোন কোন সময় এর প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করেছেন।

তবলীগের জন্য কি কি মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত এ সম্পর্কে একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, এখন নাযারাত দাওয়াত ও তবলীগ প্যাম্পলেট বা হস্তবিল ইত্যাদির মাধ্যমে তবলীগ করে, প্যাম্পলেট বা লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। কিন্তু প্যাম্পলেট এমন বিষয় যার বোঝা বেশিদিন সহ্য করা যায় না বা সহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তবলীগ হতো। সেই সব বিজ্ঞাপন দুই-চার পৃষ্ঠা সম্বলিত হতো আর এর ফলে সারা দেশে হৈচৈ সৃষ্টি হয়ে যেত। এইগুলো অজস্রধারায় প্রচার করা হতো। সেই যুগের নিরিখে অজস্র হওয়ার অর্থ হলো এক/দুই হাজার, অনেক সময় দশ হাজার সংখ্যাও বিজ্ঞাপন ছাপা হতো বা প্রচার করা হতো। তিনি বলেন, আমাদের জামা'ত এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার বা প্রপাগান্ডা হলো বিজ্ঞাপন ৫০ হাজার বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপা উচিত, এরপর দেখ যে, বিজ্ঞাপন কিভাবে নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সংবাদ বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়, আর এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশেও পড়ে। আমেরিকা থেকে একটি সংবাদ এসেছে যে, সুইডেনের কোন নিউজ এজেন্সি বা টেলিভিশন চ্যানেল সেখানে আমাদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে যে, সুইডেনে এখন ইসলামের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, বলুন এটি কি, আল্লাহ্ই জানে কেন এভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, তাই আমরা আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই। তো এভাবেও মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমার সফরের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। যাহোক বিজ্ঞাপন, খবর বা সম্প্রচার মাধ্যমের সুবাদে ব্যাপক পরিসরে সংবাদ পৌঁছে যা সাধারণ বই-পুস্তকের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, প্রথমে বছরে যদি বারো বার বিজ্ঞাপন প্রচার হয়ে থাকে,তাহলে এখন বছরে যদি তা তিনবার করে দেয়া হয় আর পৃষ্ঠা সংখ্যা যদি ২/৩ ও করা হয় কিন্তু তা যদি এক বা দুই লক্ষ সংখ্যায় প্রচার করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, তা কিভাবে গতি সঞ্চার করে। এখন আমরা দেখছি যে, এটি গতি সঞ্চার করছে এবং লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তা ছাপা হয়। অনেক সময় অনেকেই বলে যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে কি লাভ? লাভ আছে, কেননা সেইসব পত্রিকার সার্কুলেশনের মাধ্যমে জামা'ত পরিচিত হয় অথচ বই-পুস্তক আপনারা দুই মাসে যতটা বিতরণ করেন অনেক সময় এক পত্রিকার মাধ্যমে একদিনেই তার চেয়ে বেশি মানুষের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে যায়।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজকাল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জামা'ত পরিচিত হচ্ছে, আমি যেভাবে বলেছি, অনেক জায়গায় তা হচ্ছে। জামাতের প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক পরিসরে এটি হচ্ছে। সুতরাং তবলীগ বিভাগের কাজ হলো এই যে পরিচিতি, এটিকে লুফে নেয়া, আর ইসলামের প্রকৃত বাণীকে এভাবে প্রচার করতে থাকা। এমনটি মনে করা উচিত নয় যে, একবার পত্রিকায় এসেছে, ব্যাস যথেষ্ট, এটি যেন না হয়। এই মাধ্যমকে তবলীগের জন্য কাজে লাগানো তবলীগ বিভাগের কাজ। এই পরিচিতিকে তবলীগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। আর এরজন্য নিত্য নতুন পন্থা সন্ধান করা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার শিশুদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯৮ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর আসরের নামাযের পর আমার অনুরোধে আমাকে নিম্ন লিখিত কাহিনী শুনান যা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা এবং সত্যিকার তাকওয়া মানুষের মাঝে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার দায়িত্বভার নিয়ে নেন, আর এমনভাবে তার চাহিদা পূরণ করেন যে, মানুষ ভাবতেও পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এক পুণ্যবান ব্যক্তি সফরে যাচ্ছিলেন এবং এক জঙ্গল অতিক্রম করছিলেন। যেখানে এক চোর বসবাস করত যে সেই পথে যাতায়াতকারী প্রত্যেক মুসাফিরকে লুটপাট করত। অভ্যাস অনুসারে সে এই বুযুর্গের সাথেও একই ব্যবহার আরম্ভ করে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তাকে বলে যে,

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾

(সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:২৩) অর্থাৎ তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা আকাশ থেকে করা হয় আর তোমাদের এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে যদি তোমরা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তিনি বলেন, তোমার রিয্ক আকাশ থেকে আসে। আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর কর আর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং চুরি পরিত্যাগ কর। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তোমার চাহিদা পূরণ করবেন। সেই চোরের হৃদয়ে এই কথার গভীর প্রভাব পড়ে, তাই সে সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে তার কথার ওপর আমল করে। কাহিনীর পরের অংশ হলো, এর ফলে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেটে করে উন্নত খাবার তার কাছে আসতে থাকে। কোথায় আগে সে চুরি করত, আর এখন চুরি পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার ফলে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেটে উন্নত খাবার তার কাছে আসতে থাকে। কাহিনী অনুসারে খাবার খেয়ে সেই স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেট সে তার ঝুপড়ি বা কুড়েঘরের বাইরে ফেলে দিত। দৈবক্রমে সেই পুণ্যবান ব্যক্তি সেই পথে যাচ্ছিলেন আর সেই চোর, যে এখন বড় পুণ্যবান এবং মুত্তাকী হয়ে গেছে, সেই বুযুর্গের কাছে পুরো অবস্থা বর্ণনা করে এবং বলে যে, আমাকে কুরআনের অন্য কোন আয়াত শুনান। সেই বুযুর্গ বলেন যে,

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

(সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:২৪)অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর প্রভুর কসম, নিশ্চয় এটি সত্য। এই পবিত্র শব্দনিচয় শুনে তার ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, খোদার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপের ধারণায় সে ছটফট করে উঠে এবং এই অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

তো আট/দশ বছর বয়স্ক এক বালককে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কাহিনী শুনান। আর সেই বালক অর্থাৎ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই প্রবন্ধে শিশুদেরই বলছেন যে, তাকওয়া অবলম্বন করলে কত অসাধারণ সম্পদ মানুষের হস্তগত হয়। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের লালন-পালন করেন, তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি? তিনি পবিত্র এবং সত্য খোদা, তিনি আমাদের সবাইকে লালন-পালন করেন। সুতরাং সেই খোদাকে ভয় কর, তাঁর ওপরই নির্ভর কর এবং পুণ্যের

পথ অবলম্বন কর। তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এই ছিল শিশুদের অবস্থা। তাদেরকে এমন কথা শিখানো হতো যা আজকাল বড়দের জন্যও বুঝা কঠিন। তাই আমাদের প্রত্যেকের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, তাকওয়ার পথে বিচরণের চেষ্টা করুন আর খোদার সত্ত্বায় যেন পূর্ণ বিশ্বাস থাকে আর এর ওপর মানুষ যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, তিনিই আমাদের লালন-পালন ও দেখাশুনা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই পবিত্র এবং সত্য খোদা, তাঁকেই আমাদের ভয় করা উচিত, তাঁর কাছেই সব সময় যাচনা করা উচিত বা চাওয়া উচিত, তাঁর সামনেই বিনত হওয়া উচিত, তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত বা ভরসা করা উচিত। আর এই নেকী বা এই পুণ্যই এক মুসলমানের অর্জন করা উচিত, এর ওপরই আমল করা উচিত, এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

তাই শিশুদের চেয়ে জ্যেষ্ঠদের বা বড়দের জন্য এ কথার গুরুত্ব অধিক বা এই পাঠ নেয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি যখন কিনা আজকাল আমরা এই কথাগুলো ভুলতে বসেছি। অনেক সময় অনেকেই দূরে সরে যায়, আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা বা নির্ভর করার পরিবর্তে মানুষের ওপর বেশি ভরসা বা নির্ভর করে। তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত তাওয়াক্কুল খোদার সত্তায় হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার মাঝে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি আলহাজ্জ ডাক্তার ইদ্রিস বাঙ্গুরা সাহেবের যিনি সিয়েরালিওনের নায়েব আমীর ছিলেন। ২০১৬ সনের ১৩রা মে স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে তিনি ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। তিনি বু শহরে আহমদীয়া স্কুলে পড়ালেখার সময় আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সনে মজলিসে আমেলার সদস্য নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কোন না কোন পদে জামাতের সেবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। দীর্ঘকাল সেখানে ডেপুটি আমীর-১ হিসেবে জামাতের সেবা করছিলেন। সফল মুবাল্লিগ ছিলেন, অনেকেই তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। ঘর মসজিদ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও ফজর, মাগরিব এবং এশার নামায মসজিদে এসে পড়তেন। ছুটির দিন সকাল থেকে আসর পর্যন্ত সময় মসজিদে ব্যয় করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত, নফল ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করতেন। রীতিমত নামাযে জুমুআ পড়তেন, এমটিএ-তে খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা রীতিমত শুনতেন, প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোন বই পাঠ্য তালিকায় রাখতেন। সাহায্যের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য করতেন।

পেশাগত দিক থেকে তিনি ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক দিক থেকে জামাতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। বু অঞ্চলের আঞ্চলিক মুবাল্লিগ আকিল আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, কোন সময় জামাতের সদস্যরা সাহায্যের আবেদন নিয়ে আসলে যদি বাজেটে সংকুলান না হত তাহলেএমন লোকদের যারা মুবাল্লিগের কাছে আবেদন নিয়ে আসত, মুবাল্লিগ সাহেব তাদেরকে ডাক্তার সাহেবের কাছে নিয়ে যেতেন। কখনও এমন হয়নি যে, কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে আর তাকে সাহায্য করা হয়নি। মরহুম অত্যন্ত স্নেহশীল এবং দয়াদ্রচিত্ত মানুষ ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের বড় মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা করতেন। নিজের কাছে যে ঔষধ থাকত তা দিতেন এবং তাদেরকে দোয়ার অনুরোধ করতেন। গরীবদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতেন, বরং তাদের আসা যাওয়ার ব্যায়ভারও নিজেই বহন করতেন। অনেক রোগীর হাড়ের অপারেশন তিনি বিনামূল্যে করেছেন। স্বাস্থ্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কোন রোগী আসলে তাকে হাসপাতালে পাঠাতেন এবং স্বয়ং তার ফিস আদায় করতেন। তার মাধ্যমে একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ডাক্তার আলহাজ্জ শেখু তামু সাহেব বয়আত করেন এবং জামা'তকে একটি ভূমিখণ্ড তোহফা স্বরূপ দেন।

ডাক্তার বাঙ্গুরা সাহেব যখন এই সংবাদ জানতে পারেন যে, ইনি পরে এসে কুরবানীতে এগিয়ে গেছেন তখন শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মসজিদের জন্য একটি জায়গা জামা'তকে দেন, অনুরূপভাবে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৩৫ মিলিয়ন লিওনও জামা'তকে দান করেন। মরহুম জামাতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, খলীফাদের জন্য গভীর আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতেন, মুসী ছিলেন, অন্যান্য আর্থিক তাহরীকেও অংশ নিতেন। এরা এমন মানুষ যারা দূর দূরান্তের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমান আনার পর ক্রমাগতভাবে উন্নতি করেছেন। খোদা তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মে আহমদীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং তারা যেন সব সময় জামাতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মনসুরা বেগম সাহেবার যিনি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের নায়েব আমীর খালেদ সাইফুল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ২১শে জুলাই ২০১৬ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ায় ইন্তেকাল করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

তিনি নামাযী, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য গভীর আত্মাভিমানী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। নেক এবং পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। হাসপাতালেও নামাযের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন। অসুস্থতার কারণে নামাযের কথা ভুলে গেলে স্বামীকে বলতেন যে, আপনি আমার সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া এবং লিবিয়ায় সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, অনুরূপভাবে পাকিস্তানের তারবেলা এবং লাহোরের সিভিল লাইন হালকায় খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। টীম বানিয়ে কাজ করতেন, কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, রীতিমত তিলাওয়াত করতেন। নিজের সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যদের সন্তান-সন্ততিদেরও কুরআন পড়ানোর তৌফিক পেয়েছেন। ওসীয়্যত করেছেন, গভীর সচেতনতার সাথে চাঁদা দিতেন, হিস্যায়ে জায়েদাদ এবং হিস্যায়ে আমদ, ২০১৬ পর্যন্ত আদায় করেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়া দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন যারা বিভিন্নভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত আছেন। তার এক পুত্র ওমর খালেদ সাহেব এখানে বসবাস করেন, লন্ডনের একটি হালকায় তিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তার আরেক পুত্র অস্ট্রেলিয়ায় ওয়াকফে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত এবং করুনা করুন, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মে সব সময় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা বজায় রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করেন নি এবং তাঁর সকল যুদ্ধই আত্মরক্ষামূলক ছিল। ইসলাম শুধু তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা চরিত্রের বলে বিস্তার লাভ করেছে।

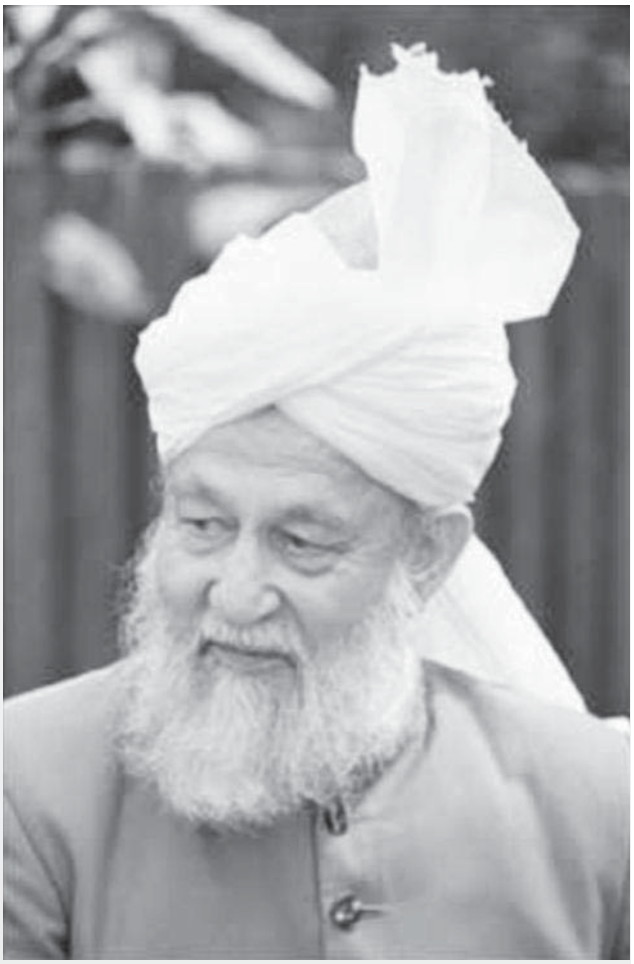

ধর্মের নামে রক্তপাত

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

ধর্মের নামে এই নজীরবিহীন রক্তপাত শুধু এজন্য করা হয়েছিল যে, তাঁরা বলেছিলেনঃ

"রাব্বুন্নাল্লাহ্"– "আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্।" ধর্মের নামে এহেন রক্তপাত শুধু এজন্যই করা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকদের নিকট মুসলমানরা ছিলেন ধর্মত্যাগী। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর মতালম্বীদের নাম মুশরেকরা সাবী রেখেছিল। সাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হত, যে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ছেড়ে অন্য কোন নতুন ধর্ম গ্রহণ করত। এই ধর্মান্তর গ্রহণ তথা ইরতেদাদের ফিৎনা (আমরা আল্লাহ্‌র শরণ নেই) দমনের জন্য তারা সে সমস্ত উপায়ই গ্রহণ করল, যা পূর্ববর্তী নবী ও জামা'তগুলোর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল।

ধার্মিকদের ওপর ধর্মহীনদের এই সকল অত্যাচার অনাচারের কাহিনী অতি দীর্ঘ। এমন এক জাতিকে এই দুঃখ দেয়া হয়েছিল, যাঁরা ধর্ম–আকাশে চাঁদ ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলো প্রদান করছিলেন, যাঁদের এমন ধর্মের উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ঘটেছিল, যাঁদেরকে ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গের উর্ধ্বে আর কোন মার্গ নেই, যাঁদের চেয়ে ভাল মানুষ ইতিপূর্বে কোন ধর্ম উৎপাদন করে নি, ভবিষ্যতেও মরলোকে কোন দিন উৎপাদিত হবে না। কিন্তু বিশ্ব-শিল্পীর সেরা সৃষ্টি এই নবীসম্রাট ও তাঁর অপুরক্তগণ অত্যন্ত ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা সাথে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিলেন। মুখে 'উহ্' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। তাঁরা নিজেরা দুঃখ ভোগ ও কুরবানী করে এবং নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম-বিরোধীরাই অত্যাচারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, ধর্মগ্রহণকারীরা নয়।

এটাই শেষ নয়। দৃষ্টান্তহীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের পর তাঁরা দয়া ও ক্ষমার এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেলেন যে, মানুষ স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক বিস্ময়ে তাঁদের দিকে এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ও বলে ঃ তাঁরা কে এবং কিভাবে তাঁরা এত উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছেছেন? যখন খোদার প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন নিকটবর্তী হল এবং মক্কার অবিশ্বাসীরা তাঁর পদানত হল এবং দশ হাজার পবিত্র আত্মার চাকচিক্যময় তরবারির নিচে আরবের খুনি রক্ত-পিপাসু নেতাদের মাথা কাঁপছিল, তখন মক্কা নগরীর প্রত্যেকটি ইট এ কথার সাক্ষী হয়ে রইল যে, বিশ্বের ইতিহাস সেদিন এক অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। ব্যাপক হত্যার আদেশের পরিবর্তে ঃ

"আজকের দিনে তোমাদেরকে কোন প্রকার তিরস্কার করা হবে না।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯৩) ঘোষণার আনন্দ-ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সেদিন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারী মানুষ ক্ষমা লাভ করল। তপ্ত বালুকার ওপর নিঃসহায় দাসদের যারা শোয়াতো তারা ক্ষমা লাভ করল। প্রখর রৌদ্রে মক্কার পথে-ঘাটে অসহায় ব্যক্তিদের যারা টানা-হেঁচড়া করত, তারা ক্ষমা লাভ করল। সেদিন নিরপরাধ মানুষের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারীরাও ক্ষমা লাভ করল। হত্যাকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক এবং লুণ্ঠনকারীকেও ক্ষমা করা হল। এরপর কিছু দিন যেতে না যেতে সেই পাশানদেরও ক্ষমা করা হল, যারা মহাসম্মানিত ব্যক্তিদের বক্ষ চিরে হৃদপিণ্ড ও যকৃত চর্বন করেছিল।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন। কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

সুতরাং, আমি বলতে চাই যে, আদম (আ.) হতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত সমগ্র ধর্মীয় ইতিহাসকে যদি মুছেও ফেলা হয় এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হতে এখনকার ইতিহাসকেও মুছে দেয়া হয়, তবুও এই মহাসম্মানিত নবীর কতিপয় বছরের ইতিহাসই এই নিগূঢ় তত্ত্ব সপ্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, ধর্ম মানুষকে জুলুম, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, পাষণ্ডতা ও হিংসা শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা দেয় দয়া, প্রেম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা; বরং এটা বলাও অন্যায় হবে না যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতদিন সেই এক দিনের কথা, অর্থাৎ মক্কা বিজয়-এর কাহিনী বর্ণিত থাকবে, ততদিন ধর্মের মুখে কেউ অত্যাচারের কালিমা লেপন করতে পারবে না, কক্ষনো না।

শুধু এটাই নয়, সেই রহমাতুল্লিল্ আলামীন জুলুমের প্রতিকারার্থে আরও এক পা অগ্রসর হন এবং খোদার পক্ষ হতে ওহী পেয়ে চিরদিনের জন্য ঘোষণা করেন ঃ

"ধর্মের নামে কোন প্রকার জুলুম বৈধ নয়।" এটার প্রয়োজনই বা কি?

"সত্য এর উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, বক্রতার সাথে এটাকে সন্দেহযুক্ত করবার কোনই অবকাশ নেই।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

উল্লিখিত পটভূমিকায় এই ঘোষণা অত্যাশ্চর্য প্রতীয়মান হয়। একদিকে অত্যাচারী দল, যারা উৎপীড়ন ও সীমা অতিক্রম করে কতিপয় নিঃসহায় ব্যক্তিকে ইরতেদান বা ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায় করল এবং বলপূর্বক বাধ্য করতে চাইল, যেন তারা নতুন ধর্ম ছেড়ে তাঁদের পূর্বেকার ধর্মে ফিরে আসেন। পক্ষান্তরে ঐ ধর্মাবলম্বীরা যখন শক্তি লাভ করলেন, তখন শক্তি লাভ সত্ত্বেও তাঁদেরকে শিক্ষা দেয়া হল ঃ

"ধর্মে কোন প্রকার জোর জুলুম নেই। সরল পথ এবং ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর সরল এবং ভ্রান্ত পথের মধ্যে গোলমাল হওয়ার কারণ নেই। অতএব যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ওপর ঈমান এনেছে, সে যেন এক মজবুত হাতলকে ধরেছে, যা কখনও ভাঙবে না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

এই ঘোষণা কত মহান, কত শান্তিপূর্ণ!

সুতরাং হে ধর্মের নামে জুলুমকারীরা, ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তা তোমরা জান না। ধর্ম হৃদয়ের পরিবর্তনের নাম। ধর্ম কোন রাজনৈতিক দল গঠন নয়। ধর্ম কোন জাতির নাম নয়। ধর্ম কোন দেশকে বুঝায় না। ধর্মের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি, যা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঘটে থাকে। এর সম্বন্ধ আত্মার সাথে। কোন তরবারি, কোন ক্ষমতা, কোন বল প্রয়োগ, কোন নিগ্রহ ও নির্যাতন যত ভীষণাকারই হোক না কেন, চিত্তের পরিবর্তন আনার ব্যাপারে ততটুকু শক্তিও রাখে না, যতটুকু একটি নগণ্য পিপীলিকা উচ্চ পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করার জন্য রাখে। তারপর অন্যত্র খোদা তা'লা কুরআন করীমে এই ঘোষণা করেছেন ঃ

"বলে দাও, সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে।" অতঃপর, কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। যে বাস্তব প্রমাণ দ্বারা হৃদয় জয় হয়, তা-ই খাঁটি সত্য। এর সাথে দৈহিক জোর-জবরদস্তির কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং বলা হয়েছে ঃ "ঘোষণা কর, সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তার নিকট হতে এসেছে। এখন ঈমান আনা, না আনা তোমাদের ইচ্ছাধীন।" (সূরা আল কাহাফ ঃ ৩০)

আবার অপর এক স্থানে খোদা তা'লা বলেছেন ঃ

"এটাই একটি উপদেশবাণী। এই উপদেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যার ইচ্ছা হয় আপন স্রষ্টা ও পালনকর্তার পথ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা আদ্ দাহর ঃ ৩০)

কত চমৎকার ও মধুর এই শিক্ষা এবং এটা কত আদরনীয়! আশ্চর্যের বিষয়, এটা সত্ত্বেও মানুষ কিভাবে এই ধারণা করতে পারে যে, ধর্ম জোর জুলুম, নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিক্ষা দেয়।

অন্য এক স্থানে আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে ঃ

"হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম), ঘোষণা কর, "আমি আমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার ইবাদত সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে করি।" (সূরা আয্‌যুমার ঃ রুকু ১৫) আমার সব কিছু তাঁরই হয়ে গিয়েছে এবং আমার ধর্ম শুধু তাঁরই জন্য।

"এবং তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার ইচ্ছা তার উপাসনা করো। আমি পথ পেয়ে গেছি।" (সূরা আয্‌যুমার ঃ ১৬) কেমন চমৎকার শান্তিপূর্ণ শিক্ষা। এরপরও কি ধর্মের নামে কোন জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারে? আরও শুনুন ঃ

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।" (সূরা আল কাফেরুন ঃ ৭)

বস্তুতঃ, ধর্মের পতাকাবাহীরা অবিচ্ছিন্নভাবে সর্বদা এই দাবীই করে আসছেন এবং কার্য দ্বারা সর্বদা এই দাবীকে সাব্যস্ত করে আসছেন। পক্ষান্তরে যারা ধর্ম মানে না তারাও চিরকাল সেই একই রব তুলে আসতেছে ঃ "বল প্রয়োগ ও জুলুম দ্বারা ধর্ম পরিবর্তনের এই অশান্তি নিবারণ কর।"

সর্বদা তারা এই একই রকম কর্মপন্থা অবলম্বন করে আসছে। অর্থাৎ জোর জুলুম ও নিগ্রহ দ্বারা তারা কার্যতঃ ধর্মকে দমন করার চেষ্টা করে আসছে।

এই বিষয় সম্বন্ধে অন্য একস্থানে আরও বিশদভাবে খোদা তা'লা বর্ণনা করেছেন। সূরা ইউনুসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন পূর্বক আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ

তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার ইচ্ছাই যথেষ্ট ছিল। বল প্রয়োগের আবশ্যক কি? তিনি সর্বময় কর্তা তিনি স্রষ্টা। সৃষ্টি সংক্রান্ত সম্যক শক্তি তাঁর আছে। যদি তিনি চাইতেন ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল জায়গার অধিবাসী এক মুহূর্তে একই ধর্মে ঈমান আনে, তাহলে তরবারির বলে এহেন সর্বশক্তিমান খোদার কোন ব্যক্তিকে মু'মিন করার চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি তাঁর বিধি এটাই চাইত যে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মন সরল হোক বা বক্র হোক প্রত্যেককেই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, তাহলে তাঁর একটি মাত্র আদেশই যথেষ্ট ছিল। বান্দা তা পালন করত। কিন্তু খোদা তা'লার চিরন্তন বিধান এটা নির্দিষ্ট হয়নি। এটা তাঁর সুদূরপ্রসারী হিকমতের সাথে খাপ খায় না। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলেন ঃ

"ঈমান আনার জন্য তুমি কি লোকদের বাধ্য করতে পার?" (সূরা ইউনুস ঃ ১০০)

"অথচ ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমান আনতে পারে না, যতক্ষণ খোদার আদেশ না হয়।"

অর্থাৎ, তারাই ঈমান আনতে পারে, যাদের সম্বন্ধে খোদা এই ফয়সালা করেন যে, তারা ঈমানের সম্পদ লাভ করার যোগ্য। কিন্তু একান্তই দুঃখের বিষয়, যদিও এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ধারাবহিকভাবে সকলেই ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের কার্য ও জীবন চরিত দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত ধার্মিকরা অত্যাচারিতের জীবন যাপন করেন, তাঁরা অত্যাচারী নন। নৈতিক শক্তির দ্বারা ধর্ম হৃদয়কে জয় করে, তরবারি দ্বারা নয়। তথাপি উত্তরকালে বিরাট আলখাল্লাধারীরা, যাঁরা ধর্ম-জ্ঞানী বা পীর-ফকীর বলে অভিহিত হতেন, কোথাও তাঁদেরকে সাধু সন্ন্যাসী, কোথাও যাজক ও ফরিসী, কোথাও পাদ্রী বা চার্চ -মিনিষ্টার এবং কোথাও মন্ত্রদাতা ও মহন্ত বলা হত–ধর্মের প্রকৃত রূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ধর্মের এই সমস্ত ইজারাদার, তাঁদের স্ব-স্ব নবীগণের নাম গ্রহণ পূর্বক তাঁদের সম্মান রক্ষার্থে এমন সব অত্যাচার করেছেন, যা দেখলে মানবতা লজ্জায় আপনাআপনি মাথা নত করে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেও এরকম হয়েছে এবং তাঁর আবির্ভাবের পরেও এরূপ হয়েছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে খ্রিষ্টান ধর্মের, বরং বলা উচিত বিকৃত খ্রিষ্টান ধর্মের বিকৃত চরিত্রের বড় বড় পাদ্রী, বিশপ ও কার্ডিন্যালগণ ধর্মের নামে খ্রিষ্টান জগতে যে সকল অত্যাচার করেছেন গুলোর দৃষ্টান্ত কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ যুগে মানুষকে দুঃখ দেয়ার যে সকল উপায় খ্রিষ্টান ধর্ম প্রধানরা উদ্ভাবন করেছিলেন তা এত ভায়াবহ যে, মানুষ সে সবের বৃত্তান্ত জানার পর বিস্ময় ও লজ্জায় হতভম্ব হয়ে ভাবে, মানবতা কি অধঃপতনের এমন গভীর অতলে পৌঁছতে পারে? মানব চিত্ত কি পাথর অপেক্ষা কঠিন হতে পারে? বস্তুতঃ এরূপই হয়েছে এবং খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেন যে, খ্রিষ্টান ধর্মের নামে যে সকল অত্যাচার মানুষের ওপর করা হয়েছে, মানবতা তা চিন্তা করে লজ্জাবনত হয়।

ইংল্যান্ডে আমি নিজে ঐ সমস্ত জুলুম করার কোন কোন অস্ত্র দেখেছি। লণ্ডনে (Madame Toussand) (মাডাম টুসো) নির্মিত একটি যাদুঘর আছে। এই যাদুঘরে ফরাসী মহিলা মাডাম টুসো বিশ্বের প্রধান প্রধান সাধু পুরুষগণের প্রতিমূর্তিও স্থাপন করেছেন। এই প্রতিমূর্তিগুলো এমন সুন্দরভাবে নির্মিত যে, সম্পূর্ণ জীবিত মানুষের ন্যায় দেখায় এবং কোন কোন সময় প্রতিমূর্তির পরিবর্তে মানুষ বলেই ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কোন কোন সময় এমনও ঘটেছে যে, বিদেশী লোক কোন সিপাহীকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে তার নিকট রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য অগ্রসর হয়ে বুঝতে পেরেছে যে, এটা জীবিত সিপাহী নয় বরং সিপাহীর প্রতিমূর্তি। যাঁরা অতিশয় মহৎ কাজ করে গিয়েছেন, এরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্তিও সেখানে আছে এবং অতি জঘন্য রক্ত পিপাসু জালেম ও কুখ্যাত অপরাধীদেরও প্রতিমূর্তি সেখানে আছে। শুধু এটাই নয়, ঐ কুখ্যাত জালেমদের অস্ত্র-শস্ত্রও সেখানে একত্রিত করে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতিও সেখানে আছে, যাদ্বারা খ্রিষ্টান ধর্ম-প্রধানরা কোন কোন ব্যক্তিকে ধর্ম-চ্যুতির অপরাধে শাস্তি স্বরূপ কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন অথবা ধর্মত্যাগ অপরাধ স্বীকার করতে ব্যবহার করতেন, যেন ঐ সমস্ত অত্যাচার, নিপীড়ন ও কষ্ট ভোগের ফলে ক্লিষ্ট হয়ে তারা তাদের ধর্মত্যাগ অপরাধ স্বীকার করে। সেসব যাতনা এত ভয়াবহ হত যে, বিনা ব্যতিক্রমে মানুষ হয়তো সীমাতিত যন্ত্রণায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করত বা অপরাধ স্বীকার করাকেই শেষ উপায় মনে করত। স্পেন বা ফ্রান্সের ইন্‌কুইজিশনের হাতে অসহনীয় যন্ত্রণায় প্রাণের চেয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত নিক্ষিপ্ত হয়ে মরাকে ভাল মনে করত। লণ্ডনের যাদুঘরে এধরণের যে সকল যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে, সেগুলোর কোনটা পর্দা দিয়ে ঢাকা এবং সেখানে লিখিত আছে যে, 'স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা এগুলো দেখবে না'। অর্থাৎ, যন্ত্রণা দেয়ার ঐ উপায়গুলো এত সাংঘাতিক যে, কর্তৃপক্ষ মনে করেন, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের পক্ষে তা অসহনীয় এবং তাদের প্রকৃতির ওপর এগুলোর অতি গভীর বিষময় প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আমি নিজের চোখে ঐ যন্ত্রগুলো দেখেছি এবং ভেবে আকুল হয়েছি যে, মানুষ খোদা তা'লার এক অপূর্ব সৃষ্টি; উন্নতি ও অবনতি, উভয়েরই শেষ পর্যায়ে সে পৌঁছতে পারে। যখন তার গতি উর্ধ্বে ধাবিত হয় তখন সে নবুওতের সোপানে পদস্থাপন করে এবং স্বীয় প্রভু, স্রষ্টা ও মালিকের সাথে বাক্যালাপ করে। পক্ষান্তরে, অধঃপতনের সময় সে বিকৃত ধর্ম আলখাল্লাধারী যাজকের আকৃতিতে এক অভিশাপ স্বরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।

যীশুর প্রতি অত্যাচারের ছবির ওপর আমার দৃষ্টি পড়ল। ক্রুশের দারুন যন্ত্রণায় তিনি ভীষণ কষ্টে "এলী, এলী, লেমা সাবাক্তানী" (ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?) বলে চীৎকার করছেন। তাঁর জাতির মতে তিনি ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। শুধু এই অপরাধে তাঁকে ক্রুশ যন্ত্রণা সইতে হয়েছিল। অন্যদিকে রক্ত পিপাসু আলখাল্লাধারী খ্রিষ্টান ধর্ম নেতাদেরকে দেখতে পেলাম, তারা এই নিগৃহীত ব্যক্তির নামে অসহায় ব্যক্তিদের ওপর সেই ধর্ম-ত্যাগেরই অপরাধে এমন এমন অবর্ণনীয় নিপীড়ন করেছিল যে, ক্রুশবিদ্ধ করার অত্যাচার ঐ সকল নির্যাতনের সামনে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়।

আমি ভাবতে লাগলাম, ইসলাম ঘোষণা করেছে ঃ

"হে মানবকুল, আনন্দিত হও। ইসলাম অনন্তকালের জন্য এই শান্তির বাণী ঘোষণা করেছে, ধর্মের ব্যাপারে চিরতরে নিগ্রহকে দূর করছে ঃ ধর্মে কোন জোর জুলুম নেই। ধর্মের নামে দুঃখ দেয়া অবৈধ।"

"ইসলাম সমুজ্জল সূর্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এর দেখানো পথ অতি সুস্পষ্ট।" আমি ভাবতেই লাগলাম। এরূপ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শান্তির বার্তার পরেও কি ভাবে কোন মুসলমান মনে করতে পারে যে, ইসলাম ধর্মের নামে জোর-জুলুম শিক্ষা দেয়। তখন আমার দৃষ্টি এ যুগের ওলামাদের ওপর পড়ল। লজ্জায় আমার চোখ নত হয়ে গেল। আমার হৃদয় ব্যাথায় ভরে উঠল। আজ, এ যুগেও এমন সব ধর্মনেতা আছেন, যারা সেই 'রহমতুল্লিল আলামীন'–যিনি আজীবন বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা, ধৈর্য গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া ও প্রেম শিক্ষা দিয়ে গেছেন; যিনি জীবনে স্বয়ং নির্মম নির্যাতন ভোগ করে গেছেন, কিন্তু কাউকেও যাতনা দেননি, তাঁর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার দাবী রাখা সত্ত্বেও তাদের হৃদয় অত্যাচার-মুক্ত নয়, বরং তাদের হৃদয়ে দ্বেষ ও রোষানল জ্বলছে। ধর্মের নামে কঠোরতা ও নিগ্রহ করা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে।

যে স্বর্গীয় বারিধারা হৃদয়ের আগুনকে নিভানোর জন্য এসেছিল, তারই বরাত দিয়ে অশিক্ষিত জন সাধারণের বক্ষে তারা হিংসা-বিদ্বেষ ও রোষাগ্নি প্রজ্জলিত করে। তারা সেই শান্তি-কর্তার নামে, যিনি তাঁর রক্তের কুরবানী দিয়ে খুন খারাবির দেশ হতে অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত করেছিলেন, তাঁরই অনুবর্তিদেরকে নিরপরাধ ব্যক্তিরা হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। যে আল-আমীনের গৃহ লুণ্ঠন করা হয়েছিল তাঁরই প্রেমের দোহাই দিয়ে তারা পৃথিবীকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করার শিক্ষা দেয়। তিনি পরস্ত্রীর, এমন কি কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরও সতীত্ব রক্ষা করতেন, যিনি সকল লজ্জাপরায়ণদের চেয়ে অধিক লজ্জাপরায়ণ ছিলেন, যিনি নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য এসেছিলেন, আজ তাঁরাই মূর্ত শ্লীলতার সুনামের বরাত দিয়ে বহু বছরের বিবাহিতা স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর জন্য হারাম করা হচ্ছে। যিনি উপাসক-শ্রেষ্ঠ অন্য ধর্মগুলোর উপাসনালয়ের হেফাজত করেছিলেন, আজ উল্লিখিত ধর্মযাজকরা তাঁরই কলেমাপাঠকারী ইবাদতকারীদের এক সম্প্রদায়ের মসজিদ উৎখাত করার ফতওয়া দিয়েছে এবং যে সকল অন্যায়, অনাচার ও অত্যাচার সেই পবিত্র নবী-প্রধান দূর করার জন্য এসেছিলেন, তা সেই মযলুম, নিগৃহীত নবীর নামেই অবাধে করা হচ্ছে। কোন মুসলমান কি ভাবতে পারে যে, আজ আমাদের প্রভু (তাঁর ওপর খোদার অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হোক) আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তিনি তাঁর উম্মতের এমন অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হতেন? না, না কখনও এরূপ মনে করো না। এতে সেই মূর্তিমান সৌন্দর্য ও কল্যাণের অবমাননা করা হয়। কোন মুসলমান ভ্রমেও কি কখনও মনে করতে পারে যে, তিনি তাঁর উম্মতের উলামাকে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অবমাননা ও লাঞ্ছনা করতে শিক্ষা দিবেন এবং উৎসাহ দিয়ে বলবেন, "আরও বেশী করে গালি দাও, জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে কুৎসা রটনা করে এবং পর্দাশীলা পবিত্র মহিলাদের নাম উচ্চারণ করে এমন জঘন্য কুবাচ্য প্রচার কর, যা নিয়ে আলোচনা করতে এক অধার্মিকও লজ্জানুভব করবে।" কোন মুসলমান কি এমন ধারণা করতে পারে যে, সেই শান্তির শাহ্‌জাদা তাঁর উলামাকে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষণ দেয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন, যার ফলে জনপদগুলোর শান্তি লোপ পায়? বা এরূপ অগ্নি সংযোগের আদেশ প্রদান করবেন, যার ফলে অসহায় দুর্বল ব্যক্তিদের গৃহ ও জিনিষপত্র অধিবাসীরাসহ অগ্নিসাৎ হয় এবং তিনি বলবেন যে, "নিবৃত্ত হয়ো না, মুরতাদদের মসজিদগুলো ভেঙে দাও। যাদের ইসলাম তোমাদের ইসলামের কোন অংশবিশেষের সাথে মিলে না, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকেও হত্যা কর? কারণ ধর্মান্তর গ্রহণের আন্দোলন দূর করার এটাই একমাত্র আধ্যাত্মিক উপায়।"

খোদার খাতিরে আপনারা আপনাদের হৃদয় পরীক্ষা করুন এবং উত্তর দিন যে, কোন মুসলমান মুহূর্তের জন্যও কি এরূপ ধারণা মনে স্থান দিতে পারে? কখনও না। সেই খোদার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে এবং মক্কার পথগুলোর প্রত্যেকটি ইট সাক্ষী, আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা, যার ওপর দিয়ে নিপীড়িত গোলামদের ধর্মান্তর গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ মৃত জীবজন্তুর ন্যায় হেঁচড়ানো হতো সেই বালুকা সাক্ষী এবং সূর্যতাপে উত্তপ্ত অগ্নিময় বৃহৎ প্রস্তর ফলকগুলো যা নিরীহ ব্যক্তিদের বুকের ওপর রাখা হত, সে প্রস্তরগুলো সাক্ষী যে, এ সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি আদম-কুল-রবির আদর্শ নয়। এটা সেই পবিত্র রসূলের রীতি নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই খোদার কসম খেয়ে আমি বলছি, তায়েফের প্রস্তর ও কঙ্করময় ভূমির প্রত্যেকটি প্রস্তর ও কঙ্কর সাক্ষী, যার ওপর মানবকুল শিরোমণির রক্ত পতিত হয়েছিল যে, আমার নির্যাতিত প্রভূ কখনও ধর্মের নামে জোর জুলুম করার শিক্ষা দেননি, শ্লীলতার নামে শ্লীলতা হানির আদেশ দেননি, ইবাদতের আড় নিয়ে উপাসনালয় উৎখাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন নি। তবে কেন আমার চোখ লজ্জাবনত হবে না? কেন আমার প্রাণ ব্যাথায় ভরে উঠবে না? সেই পবিত্র মহাপুরুষের সাথে সম্বন্ধের দাবীদার এ ধরণের ধর্ম-যাজক আজোও আছে!

"যাদের (সাথে) অকারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও (যুদ্ধ করার) অনুমতি প্রদত্ত হল; কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।" [সূরা হজ্জ : রুকু ৬]

ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে দু'টি মত

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথিবীতে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১। ইসলামের শত্রুদের মতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধ সমূহ আক্রমণাত্মক ছিল এবং ইসলাম তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে।

কিন্তু

২। নিরপেক্ষ গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হয় যে, হযরত রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করেন নি এবং তাঁর সকল যুদ্ধই আত্মরক্ষামূলক ছিল। ইসলাম শুধু তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা চরিত্রের বলে বিস্তার লাভ করেছে।

(চলবে)

(হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহে. রচিত 'ধর্মের নামে রক্তপাত' পুস্তক-এর বাংলা সংস্করণ, পৃ: ১৬-২৮, অনুবাদ: মরহুম মৌলবী আলী আনোয়ার এবং চলিতকরণ: মওলানা মামুন-উর-রশিদ)

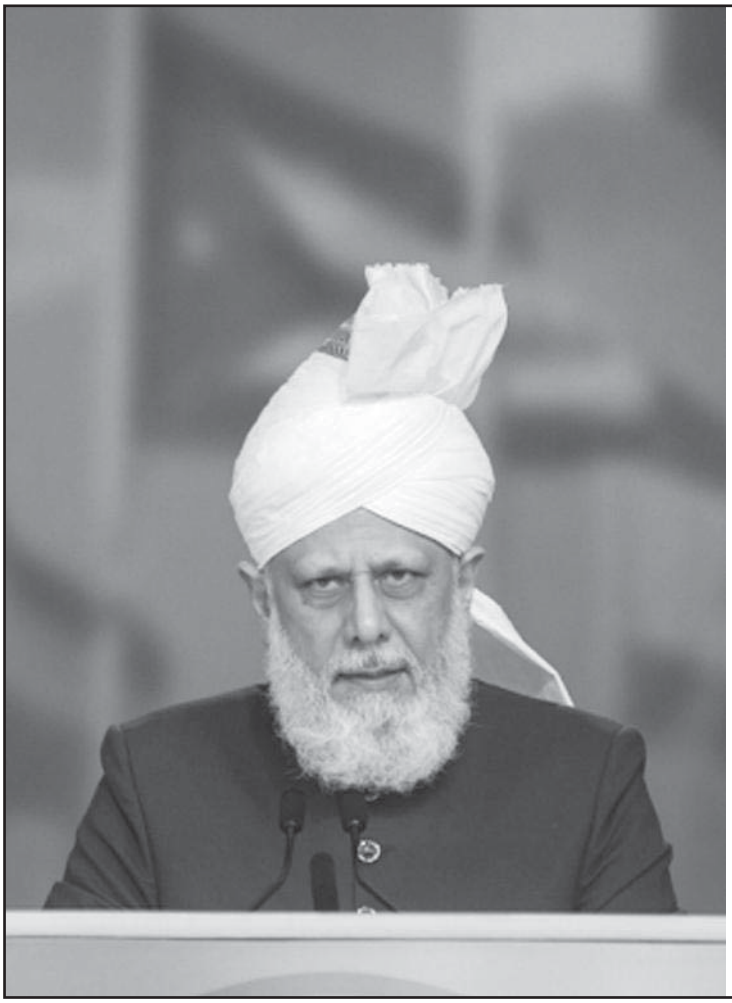

জুমুআর খুতবা

তবলীগ বা প্রচারের গুরুত্ব

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কিছু কথা উপস্থাপন করব।প্রতিটি রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি পৃথক পৃথক হবে আর প্রতিটি নিজের মাঝে এক শিক্ষনীয় দিক রাখে। কিছু কথা তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতেও বর্ণনা করেছেন। প্রথম কথা হলো তবলীগের প্রেক্ষাপটে। এতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের জামা'তকে তাদের জলসা সালানায় মনোযোগ আকর্ষণ করে বার্তা প্রেরণ করেছেন।

তিনি বলেন, আপনাদের কাজ হলো তবলীগ করা, আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আগাধ পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ইলহামে জানিয়েছিলেন, আমি তোমার প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। আর একই সাথে এটিও বলেছেন যে, যতদিন পৃথিবী বর্তমান থাকবে ততদিন খোদা তা'লা তোমার নামকে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন আর তোমার তবলীগ এবং তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তবলীগ, তার প্রচার ও কাজ এবং তার নামকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আর খোদা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই কাজ করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু একই সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তবলীগের প্রতি জামাতের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান অর্জন কর এবং তবলীগ কর, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তবলীগ করতেন।

যাহোক খোদার প্রতিশ্রুতি থেকে সর্বাত্মকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কিন্তু খোদা তা'লা এসবকে বাস্তবায়নের জন্য যারা নবীর সাথে বয়আতের অঙ্গীকার করে

তাদের ওপরও দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন যে, তারা যেন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এতে অংশ নেয় যাতে তারাও খোদার কৃপাভাজন হতে পারে। এমন হলে খোদা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের কাজে প্রভূত বরকত বা কল্যাণ রেখে দেন, তাদেরকে কল্যাণমন্ডিত করেন এবং নিত্য নতুন মাধ্যম ও উপকরণ সৃষ্টি করেন। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তবলীগের বহু মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন।

যাহোক এখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পয়গাম বা বার্তার সেই অংশ উপস্থাপন করছি যা তবলীগ সংক্রান্ত। কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং উপায় উপকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দরবেশদের মনোবল চাঙ্গা করেন। তিনি এতে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগের অবস্থার বরাতে কথা বলেছেন।তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, কাদিয়ানে আপনাদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তের, কিন্তু আপনারা হয়তো এই কথাকে ভুলে যান নি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন খোদার নির্দেশে কাদিয়ানে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তখন কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যা কেবল দুই বা তিন ছিল। তিন শত অবশ্যই তিন এর চেয়ে সংখ্যায় বেশি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির সময় কাদিয়ানের জনবসতি ছিল এগার শত। এগার শত এবং তিনের অনুপাত হলো এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি, অর্থাৎ যদি এখন, অর্থাৎ যখন তিনি (রা.) এই বার্তা প্রেরণ করেন সেই সময়, তিনি বলেন যে, এখন কাদিয়ানের জনবসতি যদি বারো হাজার ধরে নেয়া হয় তাহলে বর্তমান আহমদী জনবসতির সাথে কাদিয়ানের বাকি জনবসতির অনুপাত হবে এক অনুপাত ছয়ত্রিশ যা পূর্বে ছিল এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি।

এক কথায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেছেন তার চেয়ে আপনাদের শক্তি, এখানে কাদিয়ান বাসীদের তিনি (রা.) বলেন যে, সেই সময়ের তুলনায় এখন আপনাদের শক্তি দশগুণ বেশি। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেন তখন কাদিয়ানের বাইরে কোন আহমদীয়া জামা'ত ছিল না। কিন্তু এখন ভারতের বহু স্থানে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেসব জামা'তকে জাগ্রত ও সুশৃঙ্খল করা, এবং এক নতুন সংকল্পের সাথে তাদেরকে দন্ডায়মান করা আর এই সংকল্প নিয়ে তাদের শক্তিকে পুঞ্জিভূত করা যে, তারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের প্রচারকে ভারতের চার দিগন্তে ছড়িয়ে দিবে, এটি আপনাদেরই কাজ। আজও হয়তো এই অনুপাতই হবে, এখন আহমদীরা সেখানে হাজার হাজার হলেও অন্যদের সংখ্যাও একই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় অনেক উত্তম উপকরণ সৃষ্টি করেছেন আর মাধ্যমও খোদার কৃপায়অনেক বেশি। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় ভারতে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যারা কর্মী, যারা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লিগ ও মুরব্বী তাদেরও ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে হবে। তারা মারও খায়, বিরোধিতাও হয়, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও আমার এই কথা নিজেদের সামনে রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে তবলীগের কাজ করার এবং এটিকে ব্যাপকতর করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এটি কুরআনের নির্দেশ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও এই কথাই বলেছেন।

মহানবী (সা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা এই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য আমাদের সুসংহত, সুসংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে যেন এই কাজকে ব্যাপকতর করা যায়। আর তবলীগের পাশাপাশি নবাগতদের বা যারা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক জায়গায় তবলীগও হয় আর মানুষ জামা'তভুক্তও হয় কিন্তু এরপর তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করা হয় না। এর ফলে যারা আসে তাদের অনেকেই চলে যায়। ভারতে বেশির ভাগ গ্রাম্য এবং দরিদ্র মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে, কিন্তু বিরোধীদের পক্ষ থেকে যখন হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ হয় তখন কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ ভয়ে ভীত হয়ে ঈমান নষ্ট করে। আমাদের ব্যবস্থাপক বা কর্মী বা যারা পরিকল্পনাকারী, তবলীগের কাজে তারা যেভাবে পরিকল্পনা হাতে নেয় এর ফলে আল্লাহ্ তা'লারফযলে সেখানে ভালো কাজও হচ্ছে। নাযারাত ইসলাহ্ ইরশাদের পাশাপাশি আরো কিছু বিভাগ তবলীগের ময়দানে কাজ করছে। সেখানে নুরুল ইসলাম নামেএকটি বিভাগ আছে, আর তাদের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। ফোনের মাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেওতারা তবলীগের কাজ করছে।

একইভাবে ওয়াকফে জাদীদের ব্যবস্থাপনার অধীনেও তবলীগের কাজ হচ্ছে। এমনসব স্থান যেখানে বিরোধীরা গিয়ে নতুন

তবলীগের পাশাপাশি নবাগতদের বা যারা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক জায়গায় তবলীগও হয় আর মানুষ জামা'তভুক্তও হয় কিন্তু এরপর তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করা হয় না। এর ফলে যারা আসে তাদের অনেকেই চলে যায়।

বয়আতকারীদের বা নতুন আহমদীদের কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাদের সেখানে গিয়ে নতুন বয়আতকারীদের মনোবল দৃঢ় করা উচিত। জেলার কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের তাৎক্ষনিকভাবে সেখানে পৌছা উচিত যেখান থেকেই সংবাদ আসে যে, সেখানে কোন আহমদীর কোন প্রকার কষ্ট হয়েছে, তাছোট কোন গ্রামই হোক না কেন। একইভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সেখানকার লোকদের এবং মুবাল্লিগদের পরবর্তী যোগযোগের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং স্থানীয় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে স্থায়ীভাবে অবগত থাকার জন্য উত্তম পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত কেননা সেখানেও, যেভাবে আমি বলেছি,গতকাল দরসেও বলেছি যে, জামাতের বিরোধীরা তাদেরকে আহমদীয়াতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করার ষড়যন্ত্র নিয়েতাৎক্ষনিকভাবে পৌছে যায়। যাহোক যেখানে বেশি বয়আত হয় এমন দারিদ্র কবলিত দেশে এবংএমনসব স্থানে এই ধরণের কাজ হাতে নেয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে, যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের সময় ফিতনার পরীক্ষা কবলিত হন আর লাহোরীদের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার নেত্রীত্বের প্রয়োজন ছিল যা তিনি সেখানে লাভ করেছেন। তার সম্পর্কে অর্থাৎ তিনি তার জ্ঞান কিভাবে বৃদ্ধি করেছেন সে বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, খাজা সাহেবের উন্নত বক্তৃতা এবং লেকচারের পেছনে রহস্য কি ছিল?তিনি (রা.) বলেন, খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাফল্যের বড় কারণ ছিল তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করে একটি ভালো বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর কাদিয়ান এসে কিছুটা খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতেন, আর কিছুটা অন্যান্য আলেমদের জিজ্ঞেস করতেন আরএভাবে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য লেকচার বা বক্তৃতাপ্রস্তুত করতেন। এরপর সেই বক্তৃতা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শহর সফর করতেন এবং খুব সাফল্য পেতেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, খাজা সাহেব বলতেন যে, যদি এক ব্যক্তির কাছে বারোটি বক্তৃতা প্রস্তুত থাকে তাহলে তার অসাধারণ খ্যাতি অর্জন হতে পারে। তিনি বলেন, খাজা সাহেব সাতটি লেকচারই প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর তিনি বিলাত বা ইংল্যান্ড-এ চলে যান। কিন্তু সেই সাতটি বক্তৃতার মাধ্যমেই তিনি অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি যে, একটি বক্তৃতাও যদি ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে তা যেহেতু ভালোভাবে মুখস্থ থাকে তাই মানুষের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়তে পারে।

অতএব প্রথম হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী, যা থেকে লেকচার প্রস্তুত করা যায়। এগুলো পড়া আবশ্যক। এরপর সেগুলো একটু বুঝা বা অনুধাবন করা এবং বক্তৃতার প্রস্তুতি নেয়া। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কিছুটা বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রথম যুগে সরফ এর পৃথক শিক্ষক ছিল, নাহাবের পৃথক, কাঁচা রুটির পৃথক শিক্ষক আর পাকা রুটির পৃথক। এখন সেই যুগ আবার এসেছে যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। এখন স্পেশালাইযেশন তথা বিশেষজ্ঞ হওয়ার যুগের সূচনা হয়েছে। তিনি বলেন, এমনই হওয়া উচিত, বক্তা বা লেকচারারদের ভালোভাবে বিষয় প্রস্তুত করে দেয়া উচিত যেন তারা বাইরে গিয়ে সেই বক্তৃতাই করে। এর ফলে জামাতের উদ্দেশ্য অনুসারে বক্তৃতা হবে, আর আমরা এখানে বসেই বুঝতে পারবো যে, এরা কি বক্তৃতা করবে। এটিই আসল বক্তৃতা হবে। এছাড়া স্থানীয় কোন প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলেসমর্থন সূচক বক্তৃতা হিসেবে অন্য কোন বিষয়েও তারা কথা বলতে পারে।

তো এই হলো মুবাল্লিগ এবং তবলীগকারীদের জন্য নির্দেশিকা বা নীতি আর তাদের জন্যও যাদের জ্ঞানের আসরে আনাগোনা রয়েছে। বক্তৃতা যদি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে বড় বড় প্রফেসর এবং কিছু নামধারী ধর্মীয় আলেম এবং এমন মানুষ যারা ধর্মের ওপর আপত্তি করে তারাও প্রভাবিত হয়। সম্প্রতি তবলীগ বিভাগের ব্যবস্থাপনায়এখানে একটি অনুষ্ঠান হয়েছেযাতে ইসরাইল থেকেও এক বড় ইহুদী এসে অংশ গ্রহণ করে।তিনি বেশ কিছু পুস্তকাবলীর লেখকও। আমাদের এক যুবক মুরব্বী ভালো প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রফেসর সাহেব এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। প্রফেসর সাহেব বড় ধূর্ততার সাথে সেখানে ইসলামী খিলাফতের পক্ষে কিছু কথা বলেন, কিন্তু একই সাথে ইসলামের বিরুদ্ধেও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আমাদের এই যুবক খুব সুন্দরভাবে তার উত্তর দিয়েছেন। পরে প্রফেসর সাহেব আমার সাথে দেখা করতে এখানেও আসেন এবং বলেন যে, তোমাদের সেই বক্তা খুবই বুদ্ধিমান। আসলে ইসলামের ওপর হামলাকারী অ-আহমদী পন্ডিত এবং আলেমদের সামনে কিছু কথা বলে এরা তাদের যুক্তি খন্ডন করে বা তাদের কাছে সেই দলীল প্রমাণই নেই, কিন্তু জামাতের কাছে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রদত্ত ধর্মীয় শাস্ত্র এতটা সমৃদ্ধ যে, যদি ভালো প্রস্তুতি থাকে তাহলে যে কারো মুখ বন্ধ করা যায়। কেউ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করা আমাদের জন্য আবশ্যক যেন আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর একই সাথে এসব রচনাবলীর কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। পুরনো বা প্রবীণদের মাঝে তবলীগের একাগ্রতা কেমন মানের ছিল সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, আমি কম বয়স্ক ছিলাম, শৈশবের কিছু বন্ধুকে নিয়ে একটি আঞ্জুমান বা এসোসিয়েশন গড়ে তুলি আর তাশহিজুল আযহান পত্রিকা আরম্ভ করি। আমার সে যুগের বন্ধুদের মাঝে একজন হলেন, চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাঈয়াল সাহেব যিনি পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে মুবাল্লিগ হিসেবেও কাজ করেছেন, তিনি বলেন, চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের ঘরে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে, চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব-এর ছোট ভাই ছিলেন, একবার চৌধুরী আব্দুল্লাহ খান সাহেবের স্ত্রী আমাকে বলেন যে, আব্বাজী! অর্থাৎ চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাঈয়াল সাহেবকে আপনি যখন নাযেরে আলা নিযুক্ত করেছেন, সদর আঞ্জুমানের নাযেরে আলা ছিলেন তিনি, ঘরে তিনি আফসোস করতেন, এবং আক্ষেপ করে বলতেন যে, আমরা তবলীগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, ইনি আমাদেরকে চেয়ারে

বসিয়ে দিয়েছেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, পক্ষান্তরে আমি এটিও দেখি যে, আমাদের জামাতে এমন মানুষও আছে যারা আমাকে লিখে যে, ওয়াকফে জিন্দেগীর একটা সম্মান থাকা চাই।

তো পুরনো যুগের লোকদের তবলীগের প্রতি যে আগ্রহ এবং একাগ্রতা, এতে শিক্ষনীয় দিক হল তবলীগের জন্য তাদের গভীর আগ্রহ ছিল আর সেই তবলীগের সুযোগকেতারা অফিসে নিযুক্ত হওয়ার ওপর প্রাধান্য দিতেন। আজকাল এখানে কোন কোন সময় এমন হয় অনেকেই বলে যে, আমাদেরকে কেন্দ্রে নিযুক্ত করা হোক, এটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। এছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জামাতের যে দৃষ্টিকোণ থেকে মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদেরকে দেখা উচিত কোন কোন স্থানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সম্মান করা হয় না অর্থাৎ জামাতের সদস্য এবং সভ্যরা মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের সেভাবে যত্ন নেয় না বা সম্মান করে না, যেভাবে করা উচিত। আর এ প্রেক্ষাপটে কোন কোন স্থান থেকে এখনও অভিযোগ আসে কিন্তু একই সাথে আমি একথাও বলতে বাধ্য যে, মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের ওপর এই দায়িত্বও বর্তায় আর তাদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে যে, জামাতে নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাদেরও জ্ঞানের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চমর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতের কোন সভ্য বা সদস্য তাদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে। কোন কোন স্থানে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু লোক মুরব্বীদের সম্পর্কে অন্যায় কথা বলে বসে। মুরব্বী যেখানে সংশোধনের চেষ্টা করে সেখানে তার বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে দেয়।

পুনরায় দোয়া গৃহীত হওয়ার রহস্য কী, এর হিকমত এবং প্রজ্ঞার রহস্যের দিকটা তুলে ধরতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমন নিদর্শন দেখাতে এসেছেন আর এমন মানুষ সৃষ্টি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাদের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে সুমহান বিপ্লব সাধন করবেন।হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'চুঁ পেশ আ বারু য়ে কার ইক দুআ বশাদ' (ফারসী পঙক্তি)

এর অর্থ হলো, যা সারা পৃথিবী করতে পারে না তা এক দোয়ার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, খোদা তা'লা প্রতিটি দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা মোবারক আহমদ সাহেব-এর ইন্তেকাল হয়েছে, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন অথচ তিনি (আ.) তাদের জন্য দোয়াও করেছিলেন কিন্তু তারা ইন্তেকাল করেছেন আর এটিও তাঁর একটা নিদর্শন। কেননা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আর কোন কথা যখন পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়, সেটি নিদর্শন গণ্য হয়। সুতরাং সব দোয়া গৃহীতও হয় না আর সব দোয়া প্রত্যাখ্যাতও হয় না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যেই দোয়া গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা অবশ্যই গৃহীত হয়, কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে এবং পয়গামী বা লাহোরীদের একটি আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন, লাহোরীরা আপত্তি করে যে, মুসলেহ্ মাওউদ-এর সত্তায় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কি নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন, খোদার যেই কৃপাবারী মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর মাধ্যমে বর্ষিত হয়েছে তা চলমান বা অব্যাহত থাকা আবশ্যক। লাহোরীরা এই কথা বলার অবশ্যই অধিকার রাখে যে, তোমার মাধ্যমে সেই কল্যাণরাজি জারী হয় নি বাএই কল্যাণরাজি সূচীত হতে পারে না কিন্তু তাদের জন্য আবশ্যক হবে আমার মোকাবেলায় বা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের ইমাম ও নেতাকে নিয়ে আসা আর বলা উচিত যে, এর মাধ্যমে সেই সমস্ত কৃপারাজির বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর সত্যিই যদি খোদা তা'লা তার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিষয়াদীর সংবাদ প্রকাশ করেন আর তার দোয়া অস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা মেনে নিব যে, যদিও আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যবাদী ছিলেন। এমন আপত্তি করবে না যার মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রভাবিত হতে পারে। একদিকে বিশ্বাস কর যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন, মুজাদ্দেদই হোন না কেন, মুজাদ্দেদ হিসেবেই তোমরা তাঁকে মান যে, তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তাঁর দোয়া গৃহীত হতো, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। তো প্রথম কথা হল আমার কথা যদি না-ই বা মানতে হয় না মান, কিন্তুতোমাদের কোন ইমামকে আমার সামনে উপস্থাপন কর, কোন নেতাকে নিয়ে আস এরপর প্রমাণ কর যে, তার দোয়া গৃহীত হয়। যদি এটি প্রমাণ করতে পার যে, তার দোয়া কবুল হয় বা গৃহীত হয় তাহলে আমাদের এটি মানতে কোন অসুবিধা নেই যে, আমরা ভ্রান্তিতে আছি, কিন্তু যদি এটি বল যে, নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করছে না বা নিদর্শন সত্য প্রমাণিত হচ্ছে না, তাহলে তোমরা এর মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে প্রশ্নবানে জর্জরীত করছ।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এদের আসল চিত্র হলো এরা তো দরজাই বন্ধ করে দেয়, কোন কথাই শুনতে চায় না। কোন বিবেক সম্মত কথা বলতেও চায় না। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে আরো কিছু ছোট ছোট দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ ও ঘটণাবলী তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। এক কুঁজ মহিলার দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে, তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক কুঁজ মহিলার ঘটনা শোনাতেন, তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি চাও যে, তোমার কোমর সোজা হয়ে যাক, নাকি এটি চাও যে, অন্যরাও কুঁজ হয়ে যাক? যেহেতু কিছু মানুষ নাছোড় প্রকৃতির হয়ে থাকে, হিংসুকও হয়ে থাকে, সে উত্তর দেয় যে, দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, আমি নুজ আর কুঁজ হয়েই চলে আসছি, মানুষ আমার কুঁজ নিয়ে হাসী ঠাট্টা করে, এটি তো এখন আর সোজা হতে পারেই না, এখন তো আমি বয়ঃবৃদ্ধা হয়েগেছি, এরা সবাই যদি কুঁজ আর নুজ হয়ে যায় তাহলেই আমি আনন্দ পাব আর আমি হেসে তাদেরকে তিরস্কার করে তৃপ্তি পাব। তিনি বলেন, এই ধরণের কিছু হিংসুক প্রকৃতির মানুষ বা হিংসা পরায়ণ প্রকৃতি থেকে থাকে, তাদের এটি নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা থাকে না যে, তাদের কষ্ট দূর হোক বরং তারা চায় অন্যরা কষ্টে নিপতিত হোক। সুতরাং এমন হিংসুকদের কবল থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, আর এই দোয়াও করা উচিত যে, আমরা যেন এমন হিংসুকদের মত না

হই যারা এ ধরণের হিংসা প্রসূত কথা বার্তা বলে থাকে।

এরপর এক অন্ধের কাহিনী রয়েছে, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক অন্ধ ছিল যে রাতের বেলায় অন্য কারো সাথে কথা বলছিল, আলাপচারিতায় মত্ত ছিল, এক ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হচ্ছিল তাতে, সেই ব্যক্তি বলল যে, হাফেজ জী! ঘুমিয়ে পড়, হাফেজ সাহেব বললেন যে, আমাদের ঘুমানোর আর অর্থই বা কী, চুপ করাই তো, মুখ বন্ধ করাই তো। এই কথার অর্থ হলো ঘুমানোর অর্থ চোখ বন্ধ করা আর নিরব থাকা, আমার চোখ তো পূর্বেই বন্ধ, এখন নিরবই হয়ে যাব আর কী, নিরবতা পালন করছি। তিনি বলেন, এই যে কষ্টদায়ক অবস্থাগুলো, এগুলো মু'মিনের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে না, কেননা সে বলে যে, আমি পূর্বেই এতে অভ্যস্ত। যেভাবে মু'মিনকে এই দুনিয়ার মানুষ যখন হত্যা করতে চায় সে বলে যে, আমাকে হত্যা করে কি পাবে, আমি পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার পথে মৃত্যুকে বরণ করে রেখেছি। আল্লাহ্ যা চান আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। আল্লাহ্‌র জন্য আমার প্রাণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু মু'মিনকে যখন এই পৃথিবীর মানুষ হত্যা করতে চায় সে ভয় পায় না, সে বলে, আমি তো সেই দিনই মারা গেছি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, একমাত্র পার্থক্য হলো পূর্বে আমি চলাফেরারত এক লাশ ছিলাম এখন হয়তো আমাকে মাটির নিচে দাফন করবে, এর ফলে আমার জন্য খুব একটা পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। তো এক প্রকৃত মু'মিনের চিন্তা ধারা এমনই হয়ে থাকে।

তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত দেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক মহিলা কোন বিয়েতে যোগদান করে, যে ছিল খুবই কৃপণ কিন্তু তার ভাবী ছিল উদার। ননদ এবং ভাবী উভয়ই বিয়েতে যোগদান করে। ভাবী উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে বড় মনের ছিলেন, সেই কৃপণ মহিলা বিয়েতে এক রুপিয়া উপহার দেয় কিন্তু তার ভাবী দেয় বিশ রুপি। যখন তারাবিয়ে থেকে ফিরে আসে তখন কেউ সেই কৃপণ মহিলাকে জিজ্ঞেস করে যে, বিয়েতে কি খরচ করেছ? সে বলে যে, আমি এবং আমার ভাবী একুশ রুপি তোহফা দিয়েছি। তো চাঁদার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন কোন জামাতে কিছু সদস্য আছে যারা মন খুলে চাঁদা দেয়, চাঁদার ক্ষেত্রে বড় মনের পরিচয় দেয়, তাদের চাঁদাকে নিজের প্রতি আরোপ করা তেমনই যেভাবে এই কৃপণ মহিলার এমন কথা বলা যে, আমি এবং ভাবী একুশ রুপি দিয়েছি। কিন্তু কিছু ধনবান বা সম্পদশালী মানুষ এমনও আছে যারা কৃপণ হয়ে থাকে, জামাতের সমষ্টি বা সামগ্রিক চাঁদাকে নিজেদের প্রতি আরোপ করে, এমন দৃষ্টান্তও সামনে আসে। আর নিজেদের প্রতি আরোপ না করলেও অবশ্যই বলে যে, আমাদের জামা'ত এত টাকা চাঁদা দিয়েছেযেন তাদের জামাতে তিনি সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেন, অথচ যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের অধিকাংশ দরিদ্র আর ধনীরা সেই অনুপাতে চাঁদা দেয় না।

একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় কিছু অন্যায় কথা-বার্তা হয়, ধর্মের সম্মানকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি, জামাতের ঐতিহ্যকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি, এই সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি তাদেরকে বলেন যে, দেখ হাসি-তিরস্কার বা হাসি-ঠাট্টা বৈধ, নিষেধ নয় বা হাস্যরস নিষেধ নয়। মহানবী (সা.)ও হাস্যরস করতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও হাস্যরস করতেন। আমরাও করি, আমরা এ কথা বলব না যে, আমরা রসিকতা করি না, আমরা শতবার হাস্যরস এবং রসিকতা করি কিন্তু নিজেদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়দের সাথে করে থাকি, এতে কারো তাচ্ছিল্যের দিক থাকে না, যদি কারো তাচ্ছিল্যের দিক থাকে, কারো আত্মসম্মানবোধে আঘাত আসে তাহলে এমন হাসি-তিরস্কার সঠিক নয়। যদি মুখ থেকে এমন শব্দ বের হয় যাতে তাচ্ছিল্যের কোন উপকরণ থাকে তাহলে আমরা ইস্তেগফার করি আর সবারই তা করা উচিত। যদি ভুল বশত এভাবে কারো ঠাট্টা করা হয় যা সে অপছন্দ করে বা তার আত্মসম্মানবোধ পদদলিত হয় তাহলে ইস্তেগফার করা উচিত। সেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সেখানে একটি কথা হয়। আমি হাসি বা খেলাধুলা সম্পর্কে বলব না যে, এগুলো অবৈধ, তোমরা হাস এবং খেলাধুলা উপভোগ কর, খেলাধুলা ঠিক আছে কিন্তু খেলার ছলে যদি পিতার দাড়ি নিয়ে খেলা আরম্ভ হয় তাহলে এটি বৈধ নয় অর্থাৎ পিতার সম্মানকে যদি পদদলিত করা আরম্ভ কর তাহলে তা বৈধ নয়। খোদার মর্যাদা তাঁকে দাও, ফুটবলের মর্যাদা ফুটবলকে দাও, কবিতার আসরের মর্যাদা কবিতার আসরকে দাও, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রাপ্ত মর্যাদা ভবিষ্যদ্বাণীকে দাও। কেউ বা কতক এমন কথা বলে যাতে হাসি-ঠাট্টা বা তিরস্কারের বরাতে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা আরম্ভ করে। যদি খেলাধুলা বা হাসি-ঠাট্টার আগ্রহ থাকে তাহলে লাহোরে যাও, বিভিন্ন কবিতার আসরে যোগদান কর, সেখানে কবিরা পরস্পরের তিরস্কারও করে, এমন কবিতার আসরেই বস, আর পিপাসা নিবারণ কর, কিন্তু অন্য শহরে গিয়ে এমন কর। লাহোরে গিয়ে যদি এমন কর, বিশেষ করে কাদিয়ানের লোকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, রাবওয়া, কাদিয়ান যেখানেই কেন্দ্রীয়ভাবে জামা'তী অনুষ্ঠানের অধীনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় তাদের জন্য এতে শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে যদি এমন কর তাহলে মানুষ বলবে যে, লাহোরের মানুষ এমন করেছে, কেউ এ কথা বলবে না যে, আহমদীরা এমন করেছে। কিন্তু এখানে এর একদশমাংসও যদি কর তাহলে মানুষ বলবে যে, আহমদীরা এমন করেছে।

সুতরাং আমি হাস্যরস থেকে বারণ করি না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেও না যার ফলে জামা'ত দুর্নাম হতে পারে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র শুধু কাদিয়ান বা রাবওয়ার কথাই নয় অন্যান্য স্থানেও জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়, সেখানে যদি এমন কোন কথা হয় তাহলে জামা'ত বদনাম হয়। তাই সর্বত্র এ সম্পর্কে সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব আমাদের প্রতিটি কাজে ও গতিবিধিতে এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত তা খেলাধুলা হোক, বিনোদন বা কবিতার আসরই হোক না কেন। জামাতের সম্মানকে আমরা পদদলিত হতে দেব না, এর সম্মান এবং এর মর্যাদার প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল থাকব। তাই এই যে কয়েকটি কথা আমি বললাম, এগুলো শিক্ষনীয় কথা বা শিক্ষনীয় বিষয়, এগুলোকে দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

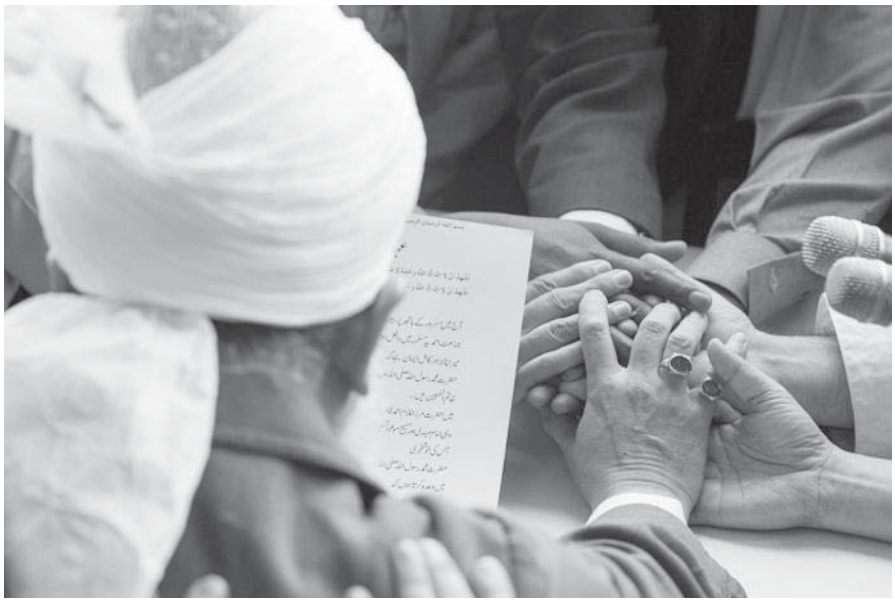

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

(৯ম কিস্তি)

তিনি (আ.) আরো বলেন:

...যখন তারা খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ ইস্তেগফার করে তখন **রূহুল কুদুসের** (পবিত্র আত্মার) সাহায্যে তাদের দুর্বলতা দূর হতে পারে এবং তারা পাপে লিপ্ত হওয়া হতে রক্ষা পেতে পারে যেরূপভাবে খোদার নবী রসূলগণ রক্ষা পেয়ে থাকেন। তারা যদি এ পর্যায়ের হয় যে, তারা পাপে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে তা হলে ইস্তেগফার তাদের এই উপকার সাধন করে যে, পাপের কুফল অর্থাৎ আযাব হতে তারা রক্ষা পায়, কেননা আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার তিষ্টিতে পারে না। আর যে সকল পাপিষ্ঠ ইস্তেগফার করে না অর্থাৎ খোদা তা'লার নিকট শক্তি যাচনা করে না তারা তাদের কৃত নিজ পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করে। (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন:

কতিপয় এমন লোক আছে যারা পাপ সম্পর্কে অবগত আবার কিছু এমনও লোক আছে যারা পাপ সম্পর্কে জানেই না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা সার্বক্ষণিক ইস্তেগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে লোকদের প্রতিটি পাপ প্রকাশ্যেই ঘটুক আর সংগোপনেই ঘটুক, জানা থাকুক আর জানা না-ই থাকুক এবং হাত ও পা, জিহ্বা ও নাক আর কান ও চোখ, যার দ্বারাই তা ঘটে থাকুক না কেন, সব ধরনের পাপ থেকেই ইস্তেগফার করতে থাকুক। আজকাল হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া বেশি বেশি পাঠ করা উচিত–

'রাব্বানা যালামনা আনফুসিনা ওয়া ইনলাম-তাগফিরলনা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসেরিন' (সূরা আ'রাফ, ৭:২৪)

অর্থাৎ– "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক ! নিশ্চয় আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর যুলুম করেছি আর তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে এবং আমাদের ওপর কৃপা না করলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এই দোয়া শুরুতে কবুল হয়ে রয়েছে। উদাসীনতায় জীবন কাটিও না। যে ব্যক্তি উদাসীনভাবে জীবন কাটায় অবশ্যই সে নিশ্চিত নয় যে, তার ওপর ভয়ঙ্কর কোন বিপদ আপতিত হবে না। কোন বিপদ ঐশী ইচ্ছার বাইরে আপতিত হয় না। যেমন আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে–

"রাব্বে কুল্লু শাইয়েন খাদেমুকা রাব্বে ফাহফাযনী ওয়ানসুরনি ওয়ার হামনী" অর্থাৎ- হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত! অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। (মলফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭, নব সংস্করণ)

ইস্তেগফার ও তওবা

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন:

"ওয়া আনেসতাগফিরু রাব্বাকুম সুম্মা তুবু ইলাইহে" (সূরা হুদ, ১১:৪)

(অর্থাৎ- তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইবে তাঁর কাছে সবিনয়ে তওবা করবে)।

স্মরণ রেখো! দু'টো জিনিষ এই উম্মতকে দান করা হয়েছে, একটি শক্তি সামর্থ্য অর্জনের জন্য অপরটি হলো অর্জিত শক্তিকে কার্যে রূপায়িত করে দেখানোর জন্য। শক্তি অর্জনের নিমিত্ত হলো ইস্তেগফার। যার অন্য অর্থ হলো সাহায্য যাচনা ও সাহায্য গ্রহণ করা অর্থাৎ সর্বদাই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা।

সুফি সাধকগণের লেখায় রয়েছে, ব্যায়াম বা শরীরচর্চা যেভাবে মল্লযুদ্ধকারী ও কুস্তিগীরদের ভার উত্তোলনে আর মুগুর চালনায় দৈহিকভাবে শক্তি-সামর্থ্য বাড়িয়ে থাকে তেমনিভাবে ইস্তেগফার হলো আধ্যাত্মিক শরীর-চর্চা। এর দ্বারা আত্মার বিশেষ শক্তি লাভ হয় আর চিত্ত দৃঢ়তা লাভ করে। সেজন্য, যে আত্মাকে শক্তিশালী করার ইচ্ছে রাখে সে যেন ইস্তেগফার করে। 'গফুর' বলা হয় ঢেকে রাখা ও আচ্ছাদিত করাকে। ইস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষ সেই সব আবেগ ও উত্তেজনাকে অবদমিত করার ও আচ্ছাদিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, যা খোদা তা'লার সাথে

সম্পর্ক গড়ায় বাধা দেয়। অতএব, ইস্তেগফারের অর্থ এটাই প্রকাশ পায় যে, বিষ সদৃশ পচন, যা আক্রমণ করে প্রাণের বিনাশ ঘটাতে চায়, তার ওপর ইস্তেগফার বিজয়ী হয়ে খোদা তা'লার নির্দেশের অমান্যকর সব পথে বাধা দিয়ে আত্মরক্ষা করার কার্যকর সেইসব রূপ পরিগ্রহ করে।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে দু'রকম প্রবৃত্তি রেখেছেন। এক, কু-প্রবৃত্তি বা কুমতি, যার মন্ত্রণাদাতা শয়তান আর অপরটি সু-প্রবৃত্তি বা সুমতি। যখন মানুষ অহংকার করে আর নিজ সত্তাকে কিছু একটা কেউকেটা ভেবে বসে আর সুমতির উৎস থেকে সাহায্য নেয় না, সেক্ষেত্রে কুমতি তথা বিদ্রোহী (মন্দ) শক্তি বিজয়ী হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে যখন তুচ্ছ্য ও হীন জ্ঞান করে এবং নিজ মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁরই সাহায্যের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে, সেইখানে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণকর এক ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়, যার দ্বারা তার আত্মা শোধন প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত হয়ে স্নাত হয়। আর এটাই ইস্তেগফারের মর্ম। অর্থাৎ এই সেই বিজয়ী শক্তি যা লাভ করে বিষ সদৃশ পচনের ওপর জয় লাভ হয়ে থাকে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত, পৃ: ৩৩৮-৩৩৯)

সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় রত থাকো

তৃতীয় শর্তে আরো এই কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, 'সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় রত থাকবে'।

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।** অর্থাৎ- যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই জন্য যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক। (সূরা ফাতেহা, ১:২)

'আলহামদু লিল্লা হিল্লাযি' লাহু মাফিস সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদে ওয়া লাহুল হামদু ফিল আখেরাতে ওয়া হুওয়াল হাকিমুল খাবীর।' (সূরা সাবা, ৩৪:২)

অর্থাৎ- সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, আকাশসমূহে যাকিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই এবং পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাবান (ও) ভালভাবেই অবহিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন– মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি খোদা তা'লার প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হয় তবে তা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সব কথা যা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ব্যতিরেকে শুরু করা হয়ে থাকে তা অকল্যাণকর ও প্রভাব-শুণ্য হয়। (সুনান ইবনে মাজা, আব ওয়াবুন নিকাহ্ এবং সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)

অপর একটি হাদীসে এসেছে:

নুমান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন– মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট হয় না সে অধিক পেলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না সে আল্লাহ্ তা'লার করুণারাজিরও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তম স্বীকারোক্তি প্রকাশ করাটাও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আর আল্লাহ্ তা'লার আশীষ সমূহের উত্তম স্বীকারোক্তি প্রকাশ না করাটা অকৃতজ্ঞতা"। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৮, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মা'য়াজ বিন জিবল (রা.) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার হাত শক্ত করে ধরলেন আর বললেন, "হে মা'য়াজ! আল্লাহ্‌র কসম! সত্যিই আমি তোমাকে ভালোবাসি," অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, 'হে মা'য়াজ! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের পরে এই দোয়া করতে ভুলে যেও না, **"আল্লাহুম্মা আই'ন্নি আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ই'বাদিকা"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে শক্তি-সামর্থ্য দান কর যেন আমি তোমার যপ-গাঁথা আবৃত্তি করতে পারি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আর তোমারই ইবাদত আরো উত্তম রূপে করতে সক্ষম হই। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন:

"মানুষ যদি গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তাসহকারে দেখে তাহলে সে অনুধাবন করতে পারবে, প্রকৃতই সব রকমের প্রশংসা ও গুণের যোগ্য হলেন আল্লাহ্ তা'লা। আর কোন মানব বা সৃষ্টি, প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থেই প্রশংসা ও গুণের অধিকারী নয়। মানুষ যদি নিঃস্বার্থভাবে দেখে তাহলে তার নিকট সহসা এটা প্রতীয়মান হবে– কোন সত্ত্বা যদি প্রশংসার অধিকার লাভ করে তাহলে হয়ত সে এজন্য অধিকারী হতে পারে যে, কোন এক যুগে যখন কোন সত্ত্বা ছিলো না বরং কোন সত্ত্বার সংবাদও ছিল না তখনও তিনি-ই ছিলেন তাদের সৃষ্টিকর্তা। অথবা এ কারণে, এমন যুগে যখন কোন সত্ত্বা ছিলো না আর জানাও ছিলো না যে-সত্ত্বা, সত্ত্বার অমরত্ব, স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং জীবন টিকে থাকার জন্য কী-কী উপকরণের প্রয়োজন, তখনও তিনিই সেইসব উপকরণ সরবরাহ করেছেন অথবা এমন এক যুগে, যখন তাদের ওপরে বহু বিপদ-আপদ আসতে পারতো অথচ তিনি দয়া করেছেন এবং তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন, আর হয়ত এ কারণেও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন যে, তিনি পরিশ্রমীর পরিশ্রম বিনষ্ট করেন না, এবং পরিশ্রমের পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দেন। যদিও মজুরীর জন্য যে কাজ করে তার অধিকার প্রদান দৃশ্যতঃ এক রকম বিনিময়ই, কিন্তু এমন অনুগ্রহশীল ব্যক্তিও হতে পারেন যিনি কাজ না হলেও পাওনা পুরোপুরি আদায় করে দেন। এসব উচ্চ পর্যায়ের গুণই কাউকে প্রশংসা ও গুণগানের অধিকারী করতে পারে।

এখন মনযোগ সহকারে দেখে নাও, সত্যিকার অর্থে এই সব প্রশংসার যোগ্য হলেন কেবল আল্লাহ্ তা'লা যিনি পরমোৎকর্ষের সাথে এসব গুণে বিভূষিত। আর কারও মাঝে এসব গুণের সমাহার নেই।

মোটকথা, প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা এবং সর্বাধিক উচ্চ হওয়ার কারণে তিনিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তাঁর তুলনায় অন্য কারও ব্যক্তিগত সত্তার দিক থেকে কোনই (প্রশংসার) অধিকার নেই প্রশংসা পাওয়ার অধিকার যদি কারও থাকে তাহলে তা কেবল আল্লাহ্‌র-ই প্রাপ্য। এটা খোদা তা'লার অনুকম্পা, তিনি এক-অদ্বিতীয় সত্তা হওয়া সত্ত্বেও নিজ করুণায় কাউকে কাউকে তাঁর প্রশংসার ভাগীদার করে নিয়েছেন। (রোয়েদাদ-এ-জলসা দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮-৬০২)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৫৫)

(ঝ) চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের বিষয়টি সঠিক ব্যাখ্যা করা কলমের জিহাদের একটি বিশেষ অংশ হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

নভোমন্ডলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লক্ষনাবলী সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেনঃ "ভূমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন ছাড়াও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগের কতক মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়ও মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ একটি হলো, তখন একই রমযান মাসের নির্ধারিত তারিখে সূর্য ও চন্দ্রে বিশেষ গ্রহণ লাগবে। আর এই লক্ষণ সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই উভয় লক্ষণ অন্য কোনো নবীর সত্যায়নের জন্য প্রকাশ পায় নি'। হাদীসটি হলো, মোহাম্মদ বিন আলী বর্ণনা করেন, 'আমাদের মাহদীর দু'টো নিদর্শন আছে; এই নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের সময় থেকে আজ অবধি কখনোও প্রকাশ পায় নি। একটি হলো, রমযানের প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে, আর দ্বিতীয়ত, একই রমযানের মধ্যবর্তী তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে; আর এই উভয় ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কখনো ঘটেনি (দারকুতনী, পৃঃ১৮১)। এই নিদর্শন নিজের মাঝে বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব রাখে। প্রথমত, মাহদী ছাড়া অন্য কোনো দাবীকারকের জন্য ইতপূর্বে তা প্রকাশ পায় নি। দ্বিতীয়ত, এই নিদর্শন সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নীদের গ্রন্থ মতৈক্য রাখে। কেননা, উভয় কর্তৃপক্ষের সঙ্কলিত হাদীস গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। অতএব, এতে তদলীস ইত্যাদির সন্দেহ করা যেতে পারে না। (টিকাঃ এক ব্যক্তি নিজের শিক্ষকের বরাতে সেই কথা বলে যা সত্যিকার অর্থে শিক্ষকের কাছে সে শুনে নি; বা সমসাময়িক যুগের কোনো ব্যক্তির বরাতে এমন কোনো কথা বর্ণনা করে, যা সে নিজে শুনে নি; পরিভাষাগতভাবে হাদীসশাস্ত্রে এ অবস্থাকে তদলীস বলা হয়)। এই নিদর্শনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, অতীতের গ্রন্থাবলীতেও এসব লক্ষণ সাপেক্ষে মসীহ্‌র দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন ইঞ্জিলে মসীহ্ (আ.) স্বীয় আগমনের লক্ষণাবলী হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন যে, 'তখন সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে আর চন্দ্র নিজের আলো দেবে না।' (মথিঃ ২৪ অধ্যায়, আয়াত ২৯)। অন্য ভাষায় যার অর্থ হলো, তাঁর যুগে সূর্য ও চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে।

[যদিও আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করছি, যার উল্লেখ হাদীসে আছে। কিন্তু, আমি এ স্থানে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না যে, পবিত্র কুরআনে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার বিভিন্ন লক্ষণের মাঝে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ-কে একটি লক্ষণ আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুরা কিয়ামায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'সে জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামত কবে হবে? আমরা এর লক্ষণাবলী বলছি, তা তখন হবে যখন দৃষ্টি বিস্ফারিত হবে' (সুরা আল ক্বিয়ামাঃ ৭-৯)। এর অর্থ হলো, এমন ঘটনা ঘটবে যা মানুষকে হতবাক করবে। অর্থাৎ, চন্দ্রগ্রহণ হবে আর এরপর সূর্য ও চন্দ্রকে সমবেত করা হবে; আর চন্দ্রগ্রহণের পর সূর্যগ্রহণ হবে। যেহেতু মসীহ্‌র আগমনই কিয়ামত সন্নিকটবর্তী যুগে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে; তাই, পবিত্র কুরআন দ্বারাও উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত বিষয় সমর্থিত।[৪১]

গ্রহণ সম্পর্কে অন্যান্য ধর্ম–গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে : অন্যান্য ধর্ম–গ্রন্থে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য–গ্রহণ সম্পর্কে আখেরী যামানা তথা কলি–যুগের বিশেষ চিহ্ন এবং ঐশী নিদর্শন হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ বিষয়ে অন্যান্য ধর্মের পরিচিতি ও পর্যালোচনা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে সেগুলো পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বচ্ছ–হৃদয়ের জন্য একটি নিদর্শন বা নিশানই যথেষ্ট নয় কি?

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত আহমদ (আ.) ঘোষণা করেছেনঃ

* "সাফ দিলকো কসরতে এজাজ কি হাজত নেহী, এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গর দিল মেঁ হো খওফে কিরদিগার।"

অর্থঃ স্বচ্ছ–হৃদয়ের জন্য অনেকগুলো সাক্ষ্য–প্রমাণের প্রয়োজন নাই। একটি নিদর্শনই যথেষ্ট যদি হৃদয়ে সেই পরম–বন্ধু অর্থাৎ খোদার শাস্তির ভয় থাকে।

* "বস্তুতঃ কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি চন্দ্রগহণ ও সূর্য–গ্রহণের নিদর্শনটি ছিল আমার দাবীর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে" [তোহফায়ে গোলড়বিয়া পুস্তক]

* "ইসমাউ সাওতাস সামা জাআল মসীহ, জাআল মসীহ। ইসমা বুরদে নিশাঁ আল–ওয়াক্ত মিগুয়েদ যমিঁ।"

অর্থঃ "আকাশ থেকে ধ্বণী উচ্চারিত হচ্ছে–মসীহ এসে গিয়েছে, মসীহ এসে গিয়েছে। ...আসমানী নিদর্শন বার বার ঘোষণা করছে যে যথা–সময়ে মসীহ এসে গিয়েছে।"

শেষকালে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ–মাজুজের প্রচন্ড বিশৃংখলা-সৃষ্টিকারী কর্ম-কান্ড সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যঃ

প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কলমের জিহাদ (অস্ত্রের জিহাদ নয়) কিভাবে পরিচালনা করতে হবে– এই বিষয়টি চলমান আলোচনার অংশবিশেষ।

এই পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হলো দাজ্জাল ও ইয়াজুজ–মাজুজ।

দাজ্জাল সম্পর্কিত বাইবেলে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপঃ

যোহনের প্রথম পত্র ২ঃ১৮

"শিশুগণ, শেষকাল উপস্থিত, আর তোমরা যেমন শুনিয়াছ যে, 'খৃষ্টের শত্রু' (Anti-Christ) আসিতেছে, তেমনি এখনই অনেক খৃষ্টের শত্রু (Anti-Christ) হইয়াছে। ইহাতে আমরা জানি যে, শেষকাল উপস্থিত।"

নোটঃ শেষকালে খৃষ্টের শত্রু হিসেবে Anti-Christ বা দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

যোহনের প্রথম পত্র ২ঃ২২

"যীশুই খৃষ্ট, ইহা যে অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যাবাদী কে? সেই ব্যক্তি খৃষ্টের শত্রু (Anti-Christ) †য পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে।"

নোটঃ দাজ্জালী ফিতনা মিথ্যার দ্বারা সম্প্রসারিত হবে।

যোহনের দ্বিতীয় পত্রঃ ৭

"কারণ অনেক ভ্রম–সৃষ্টিকারী (ভ্রামক) জগতে বাহির হইয়াছে। যীশু–খৃষ্ট মাংসে আগমন করিয়াছেন, ইহা তাহারা স্বীকার করে না। এই তো সেই ভ্রামক ও খৃষ্টের শত্রু (Anti-Christ)।"

নোটঃ যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রচারকারী ভ্রামকরাই দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত।

ইয়াজুজ–মাজুজ সংক্রান্ত বাইবেলে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীঃ

পুরাতন নিয়মের 'যিহিস্কেল' নামক অধ্যায়ের ২৮ ও ৩৯ (Gog and Magog) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা অনেক দীর্ঘ–বর্ণনা। সেই বর্ণনার অংশ–বিশেষ নিম্নরূপঃ

যিহিস্কেল ৩৮ ঃ ১–৩

"আর সদা–প্রভূর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল। হে মনুষ্য–সন্তান (ঝড়হ ড়ভ গধহ), তুমি রোশের, মেশকের ও তূবলের অধ্যক্ষ মাগোগ দেশীয় গোগের দিকে মুখ রাখো ও তাহার বিরুদ্ধে ভাববাণী বল। তুমি বল, প্রভূ সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, হে গোগ, রোশের, মেশকের ও তুবলের অধ্যক্ষ, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ।"...

নোটঃ গোগের বিপক্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ অবস্থান গ্রহণ করবেন এবং মোকাবেলা করবেন।

যিহিস্কেল ৩৮ঃ ১৮–২০

"সেইদিন যখন গোগ ইস্রায়েল–দেশের বিরুদ্ধে আসিবে, তখন আমার কোপাগ্নি আমার নাসিকায় উঠিবে, ইহা সদা–প্রভূ বলেন। কারণ আমি নিজ অন্তর্জ্বালায় ও রোষানলে বলিয়াছি, অবশ্য সেই দিন ইস্রায়েল–দেশে মহাকম্প হইবে। তাহাতে সমুদ্রের মৎসগণ, আকাশের পক্ষিগণ, বনের পশুগণ, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং ভূতলস্থ মনুষ্য সকল আমার সাক্ষাতে কম্পমান হইবে, পর্ব্বত সকল উৎপাটিত হইবে, শৈলাগ্র সকল পতিত হইবে এবং সমস্ত প্রাচীর ভূমিসাৎ হইবে।"

নোটঃ গোগের বিশৃংখলা–সৃষ্টির কারণে ঐশী শাস্তি সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে এবং যুদ্ধ–মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।

যিহিস্কেল ৩৯ ঃ ১

"আর হে মনুষ্য–সন্তান, তুমি গোগের বিরুদ্ধে ভাববানী বল। প্রভূ সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, হে গোগ! রোশের, মেশকের ও তুবলের অধিপতি, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ।"...

নোটঃ গোগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত মসীহ দাঁড়াবেন এবং তাকে প্রতিহত করবেন।

যিহিস্কেল ৩৯ঃ৬

"আর আমি মাগোগের মধ্যে ও নিশ্চিন্ত উপকূল–নিবাসীদের মধ্যে–অগ্নি প্রেরণ করিব তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভূ।"...

নোটঃ মাগোগ ও তার অনুসারীদের উপর অগ্নি বর্ষিত হবে যা যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী।

যিহিস্কেল ৩৯ঃ১১

"আর সেই দিন আমি ইস্রায়েলের মধ্যে গোগকে কবরস্থান দিব, তাহা সমুদ্রের পূর্ব–দিকস্থ পথিকদের উপত্যকা এবং তাহা পথিকদের গতি রোধ করিবে। সেই স্থানে লোকে গোগকে ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে কবর দিবে এবং তাহার নাম রাখিবে গে–হামোন–গোগ (অর্থাৎ গোগীয় লোকারণ্যের উপত্যকা)।"

নোটঃ গোগ ও তার অনুসারীদের মহা-বিপর্যয় এবং চরম পরিণতি অবধারিত।

যিহিস্কেল ৪৩ ঃ ১–২

"পরে তিনি আমাকে পূর্বাভিমুখে দ্বারের নিকটে আনিলেন। আর দেখ; পূর্বদিক হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ আসিল, তাঁহার শব্দ জলরাশির শব্দের ন্যায় এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তিময় হইল।"...

নোটঃ পরিশেষে ইস্রায়েলের পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসীহের মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজের সৃষ্ট মহা-ধ্বংস-লীলা থেকে পৃথিবীবাসী পরিত্রাণ লাভ করবে এবং পৃথিবীব্যাপি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইস্রায়েলের পূর্ব দিক তথা কাদিয়ান থেকে আবির্ভূত হয়েছে।

বাইবেলে নূতন নিয়মের অন্তর্ভূক্ত প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ ৭–১০

"সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তারা কারাগৃহ হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে সে পৃথিবীর চারিকোনে অবস্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে। তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তূল্য। তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘিরিল। তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল। আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল শয়তান অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।...

নোটঃ ইয়াজুজ–মাজুজের সৃষ্ট মহা–বিধ্বংসী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের দাবানলে জাতিসমূহ নিপতিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এই যুগে পূর্ণ হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ংকরী ধ্বংসলীলার মাধ্যমে এবং আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের পায়তারা মানব–জাতির ভাগ্যাকাশে ব্যাপকহারে ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহের যথাসময়ে আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে (দানিয়েল ঃ ৭ম অধ্যায় এবং বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

দানিয়েল ঃ ৭ম অধ্যায়

"আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।"

নোটঃ মনুষ্য–পুত্রের ন্যায় বলতে মসীলে ঈসার আগমনের কথা বলা হয়েছে।

(চলবে)

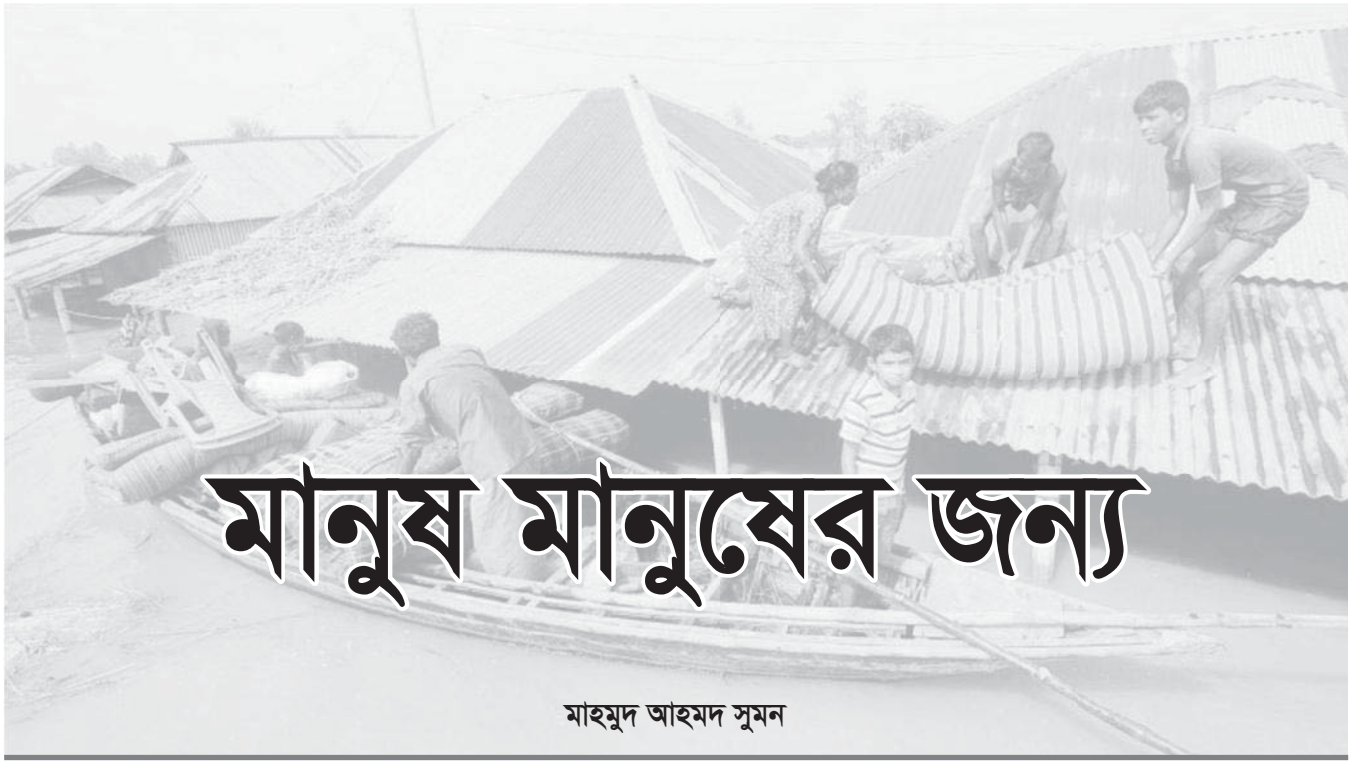

মানুষ মানুষের জন্য

মাহমুদ আহমদ সুমন

"মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি
মানুষ পেতে পারে না ...ও বন্ধু।"

কবি যথার্থই লিখেছেন। আসলে মানুষের জন্যই মানুষ। সংকটে, বিপদে-আপদে মানুষই ছুটে এসে সাহায্য করবে এই প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। না হলে মানব-জন্ম অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবিরাম বৃষ্টি এবং উজান থেকে নেমে আসা ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে বলে গণমাধ্যম থেকে আমরা সংবাদ পাচ্ছি। বেশ কয়েকদিন থেকে উত্তরাঞ্চলের সাতটি জেলায় কয়েক লাখ লোক পানিবন্দি হয়ে আছে। এ বছর বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাতের সঙ্গে উজানের পাহাড়ি ঢল যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন নদ-নদীর পানি ইতোমধ্যে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, পদ্মা, যমুনা ও সুরমাসহ প্রধান নদীগুলোর পানি প্রবাহের তোড়ে ভাঙনে বিলীন হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি ও খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে প্রবল আকারে। বন্যায় অনেক দরিদ্র পরিবারের বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ যা ছিল সব কিছু শেষে হয়ে গেছে। পানিতে ভাসছে মানুষ। জমি জমা তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। বন্যা দুর্যোগে পশু পাখিদেরও ঠাঁই নেই। মানুষের হাহাকার। লাখ লাখ মানুষ ভিটামাটি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে উজানে।

কোনো মুসলমানই বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া অশেষ নেকির কাজ। এসব ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করাই ইসলামের শিক্ষা। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহপাক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা ঘরে বসেই তার বান্দাদের কষ্ট দূর করার মাধ্যমে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। যারা আল্লাহর বান্দার কষ্টের সময় সহযোগিতা করে আল্লাহপাক তাকে তার বন্ধু বানিয়ে নেন। আমরা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি এসব অসহায় মানুষদের পাশে দাড়িয়েও। এ জগতে কেউ যদি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে আহারের ব্যবস্থা করে তাহলে আল্লাহপাক তাকে অসংখ্য নেয়ামতে ভূষিত করেন।

যেভাবে হাদিসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে মানুষকে খাদ্য দান করেছে, সেদিন তাকে খাদ্য দান করা হবে। যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য মানুষকে পানি পান করিয়েছে, তাকে সেদিন পানি পান করিয়ে তার পিপাসা দূর করা হবে। যে মানুষকে বস্ত্র দান করেছে, তাকে সেদিন বস্ত্র পরিধান করিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করা হবে' (আবু দাউদ)। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছরই কম বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক হানা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনো এমনভাবে ধেয়ে আসে যার ফলে গ্রামের পর গ্রাম তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক, মানুষের এতে কোনো হাত নেই। এধরণের দুর্যোগ মহান খোদাতাআলা যেকোনো দেশে এবং যেকোনো শহরে যেকোনো মুহূর্তে ঘটাতে পারেন। এইসব দুর্যোগে কোনো মানুষের হাত থাকে না। আমরা কেউ বলতে পারি না কোন সময় আমরা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছি বা কখন প্লাবনে আমাদের সব কিছু ডুবিয়ে দেয়। তাই এসব প্রাকৃতিক আজাব থেকে যেন আল্লাহপাক আমাদের নিরাপদ রাখেন এজন্য সব সময় দোয়া করা আর আল্লাহর হক এবং বান্দার হক সব সময় আদায় করা উচিৎ।

বন্যা সৃষ্টিকর্তার এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই যে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধেয়ে

আসছে এসব আসলে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত। হযরত নুহ (আ.) এর উম্মতদেরও আল্লাহ্ তা'লা বন্যার প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নুহ (আ.) এর কিশতির ঘটনা আজও ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নাফরমানি, সুদ, যেনা-ব্যাভিচার বেড়ে গেলে আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে বান্দাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। সতর্ক করেন পাপ পঙ্কিলতার। খোদা সতর্ক করছেন যেন আমরা আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহপ্রেমিক হয়ে যাই। সমাজ ও দেশের বেশির ভাগ মানুষ যখন পাপ, ব্যাভিচার, অন্যায় এবং খোদাকে ভুলতে বসে তখনই খোদাতাআলা তার পক্ষ থেকে বিভিন্ন আজাব নাজিল করেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতাআলা বলেন, 'এমন কোন জনপদ নেই যা আমরা কেয়ামতের আগে ধ্বংস না করব, অথবা অতি কঠোর আজাব দিব' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৫৯)। আল্লাহতাআলার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী আজ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। বন্যা একটি আজাব, মনে হচ্ছে তা কেয়ামত তথা মহাধ্বংসের পূর্বলক্ষণ স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। আর এসব পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের সত্যতার জলন্ত নিদর্শন বহন করছে। খোদাতাআলা পরম করুণাময়, তিনি কোন জাতিকে সাবধান না করে কখনও আজাব অবতীর্ণ করেন না। তবে বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও বন্যায় আক্রান্ত অসহায় মানুষদের সেবায় এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিয়েছে ইসলাম। বিপদ আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের চিরকালীন শিক্ষা। আর্ত মানবতার সেবায় মুসলিম শাসকরা রাতের আঁধারে ঘুরে ঘুরে অনাহারীদের মুখে খাবার জুটিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মুসলিম শাসকরা। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন, যে তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করে' (বুখারি ও মুসলিম)। তিনি (সা.) আরও বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো। আকাশের মালিক আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' (মুসতাদরাক)।

এছাড়া আমাদের মত একটি গরিব দেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ হজে গিয়ে থাকেন, অথচ তারই ভাই বন্যায় কবলিত হয়ে খেয়ে না খেয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করছেন, তাদের খোঁজ খবর নেয়ার মত কেউ নেই। অথচ লাখ লাখ টাকা খরচ করে হজ্জ করছেন, এই হজ্জ কি আল্লাহপাক গ্রহণ করবেন?

বন্যায় হাজার হাজার ঘরবাড়ি পানির নিচে, ছোট ছোট শিশুরা কান্নাকাটি করছে খাবারের জন্য, কিন্তু খাবার রান্না করার মত যে কোন ব্যবস্থা নেই। এ ধরণের দুর্যোগের পর সমাজ ও দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে আমরা দুর্যোগ কবলিত লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। আমাদের সবার একটু সহযোগিতার ফলে একটি পরিবার ফিরে আসতে পারে স্বাভাবিক জীবনে। বন্যার কারণে তারা যা হারিয়েছে হয়তো তা আমরা পুরণ করতে পারবো না কিন্তু তাদের জন্য যদি আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে হয়তো তারা সব হাড়ানোর যে দু:খ তা থেকে কিছুটা হলেও সুখ খুঁজে নিবে। আমরা কী পারি না এই সব দুর্যোগ কবলিত লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে? আমরা কী পারি না তাদের দু:খের দিনের বন্ধু হতে? মানুষ হিসেবে কী আমাদের ওপর এই দায়ীত্ব বর্তায় না তাদের সাহায্য করা? সমাজে অনেক এমন মানুষও রয়েছেন যারা সব সময় অন্যের সাহায্যের জন্য নিবেদিত থাকে। আমাদের উচিত হবে ঈদুল আযহিয়ার আনন্দে এসব অসহায় লোকদেরকে সাথে নিয়ে ঈদ উদযাপন করা, তাদের জন্য ঈদেও তৌহফা নিয়ে যাওয়া এবং তাদের মাঝে কুরবানীর মাংস বিতরণ করা।

ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাহায্যের জন্য দেশের বিত্তশালী, বিভিন্ন এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সাধারণ মানুষকে পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা নিতান্তই গ্রামের সহজ-সরল দরিদ্র মানুষ। আমরা যদি সবাই মিলে এদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই তাহলে হয়তো তারা নতুন করে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে। অবুঝ শিশুদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে। এইসব লোকদের জন্য আমাদের অনেক কিছুই করার আছে, আমাদের সবার সম্মিলিত সহযোগিতার ফলে হাজারো মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সহায়ক হতে পারে।

আসুন, আমরা সবাই সেইসব লোকদের পাশে যাই, যারা অপেক্ষায় বসে আছেন, হয়তো আল্লাহ কোন ফেরেশতাকে পাঠাবেন আমাদের সাহায্য করতে, আমাদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিবে। এসব পরিস্থিতিতে সবারই সুযোগ আছে একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে গড়ে উঠার। আপনার আমার সকলের। অসহায় পরিবারটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি আপনি আমি সবাই আর হয়ে উঠতে পারি 'মানুষের মত মানুষ'।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বানভাসি অসহায় লোকদের পাশে দাঁড়ানোর একটি সুন্দর মন দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

ঈদের তকবীর পাঠ

ঈদগাহে যাতায়াতের সময় নিম্নলিখিত তকবীর পাঠ করা উচিত–

"আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

এ তকবীর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর হতে শুরু করে ১৩ তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত উক্ত তকবীর প্রতি ফরয নামাযের পর তিনবার করে উচ্চঃস্বরে পাঠ করতে হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল-এর সাহিত্য অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ

মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবী যখন হতাশায় নিমজ্জিত, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত ঠিক সেই ক্ষণে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব। অবহেলিত, শোষিত এবং নিপীড়িত মানবতার সপক্ষে বলিষ্ট কণ্ঠস্বর নিয়ে এগিয়ে এলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ঔপনিবেশ শক্তি, ইংরেজদের অত্যাচারের দৃশ্য, হিন্দু মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং নারীদের ওপর পুরুষদের অত্যাচার কবির লেখনীকে সাম্যবাদী হতে বাধ্য করে। নজরুল মনে প্রাণে মুসলিম ছিলেন। বিশ্বনবী (সা.) এর প্রেমে বহু কবিতা গান তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন এটা এক প্রকার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতারই নামান্তর।

কাজী নজরুল ইসলাম অসত্য-অমঙ্গল ও অকল্যাণের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন স্বদেশের মাটি এবং তার মানুষকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুচতুর কৌশলে ভারত-বর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে দেয় (অনেকের ধারণা) এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তুলে নিরপেক্ষ সম্প্রীতির সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নজরুল সাম্যের গান গাইলেন–

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।

হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন-ইহুদী, সাঁওতাল, গারো সকলের ভেদাভেদ দূর করার কথা বলেছেন। কুরআন, পুরান, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল ত্রিপিটক পড়ে মগজ ক্লান্ত করে নয়, বরং মানুষের সকল ধর্মের তীর্থস্থানের উর্ধ্বে মানব হৃদয়। এ হৃদয়ই সেই নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, বুদ্ধ, গয়া এ জেরুজালেম এ মদীনা এ মসজিদ এ মন্দির এ গীর্জা এই হৃদয়।

এমন অনুভূতি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনেক শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছে। যাদের নাম মনে পড়ে তার মধ্যে ভলটেয়ার, রুশো, বায়রন, পরলো নেরুদা, শেলী, ম্যাক্সিম গোর্কী, গ্যাটো, পল এলুয়ার, নাযিম হিকমত উল্লেখযোগ্য। কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে বিদ্রোহের অনুভূতি সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু নজরুল কাব্যে বিদ্রোহের প্রকৃত রূপটি কি, তার উৎস কোথায়, তার লক্ষ্য কোন অভিমুখে এইসব প্রশ্নের নানা মতের উপস্থিতি আজ সর্বজনবিদিত। অগ্নিবিনা কাব্যের বিদ্রোহী কবিতাটি তার বিদ্রোহী কবি হবার প্রমাণ বহন করে।

"মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত/আমি সেইদিন হব শান্ত/যবে উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল/আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম/রণভূমে রনিবে না। বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত।"

অপরপক্ষে বাঙালি জাতির অস্তিত্বে নিহিত প্রাণচাঞ্চল্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে নিগুঢ় আত্মার সম্পৃক্তি তাকে সূর্যলোকের সীমাহীন বিস্তারের সাথেই কেবল তুলনা করা যেতে পারে। সভ্যতা, ইতিহাস ও শিল্পের সমস্ত বিষয়ে ব্যাপকতার মাধ্যমে অর্জন করে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র এক উত্তরাধিকারের নির্মাতা। তার কবি চেতনা ইতিহাসে এসেছে রূপরস ও প্রাণ নিয়ে।

নজরুল কাব্যে পৌরানিক কাহিনীর বর্ণবহুল ও বৈচিত্রময় ব্যবহার আমরা লক্ষ করি-যেমন:

(১) ভারতীয় পৌরানিক কাহিনী ও ঐতিহ্যের ব্যবহার (২) বাংলার দেশজ লোকগাথা ও লোক ঐতিহ্যের ব্যবহার। (৩) ইউরোপীয় পৌরানিক কাহিনীর ব্যবহার, (৪) ইসলামী ঐতিহ্যের নবমাত্রিক প্রয়োগ। (৫) মধ্যপ্রাচ্যীয় পৌরানিক উৎসের ব্যবহার যেমন হিব্রু পৌরানিক কাহিনী, পারশিয়ান পৌরানিক কাহিনী, ইসলাম পূর্ব আরবীয় লোকগাথা।

প্রথম পর্যায়ের কবিতায় নজরুল ইসলাম উপনিবেশ শৃংখলিত অন্তর্দ্বন্দ্বময় সমাজের জাগরণকামী আকাংখাকে রূপদান করেছেন। অবরুদ্ধ, নিরস্তিত্ব ও শক্তিহীন সমাজের তারুন্য ও পৌরষের প্রতীক হিসেবে পৌরানিক উৎসকে ব্যবহার

করেছেন। ভারতীয় পুরানের ব্যবহার–

১- মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, ২- আমি হোম শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি, আমি যত্ত আমি, পুরোহিত আমি অগ্নি।

৩- আমি ক্ষ্যাপা আমি দুর্বাসা। বিশ্বমিত্র শিষ্য, আমি দাবানল, দাহন করিব বিশ্ব।

৪- আমি পরশুরামের কাঠোর কুঠার।

আর বাংলার দেশজ লোক গাথাকে দেশের মৃত্তিকামূল থেকে আহরণ করেছিলেন নজরুল ইসলাম। যেমন "আমি শ্যামের হাতের বাশরী"।

তিনি ইউরোপীয় পুরানেরও ব্যবহার করেছেন,

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহাসিন্দু উতলা ঘুম ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম।

অর্ফিয়াস অর্থাৎ ইউরোপীয় বা গ্রীক পুরানের ব্যবহার করেছেন কবি তার অসীম শক্তির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে। গ্রীক পুরানে অর্ফিয়াস যেমন তার মৃত প্রিয়াকে বাঁশির সুরের দ্বারা বাঁচিয়ে তুলেছিলেন কবি এখানে সেরূপ শক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত হতে চেয়েছেন। অবসাদের পরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কবি গ্রীক দেবতা আর্ফিয়াসের বাঁশির সুরের কামনা করেছেন।

এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসের আদলের প্রাণময় উৎস্যকে নজরুল ইসলাম সৃষ্টিশীল চেতনার অনুষঙ্গে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইসলমী ঐতিহ্যের বিস্তৃত পটভূমিতে, অবরুদ্ধ সমাজের মুক্তি আকাঙ্খা জাগ্রত কবি চৈতন্য বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে কখনো কাব্যে রূপদান করেছে, কখনো ঐতিহ্য অনুষঙ্গ ও অন্যরূপ ভাব ব্যাঞ্জনায় অভিব্যক্ত করেছেন। যেমন :

(১) আমি ইস্রাফিলের সিংগার মহা হুঙ্কার

(২) ধরি স্বর্গীয় দূত জীব্রাঈলের আগুনের পাখা শাপটি

(৩) এই দিন নীলা ময়দানে

পুত্র স্নেহের গর্দানে

ছুরি হেনে খুন ঝরিয়ে নে

রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্রপন।

পরিশেষে বলা যায়, তিনি ছিলেন জনজীবন সম্পৃক্ত কবি। কাজী নজরুলের জীবনবোধের কেন্দ্রীয় মিমাংসাটি হলো– শোষণ বঞ্চনা নিপীড়নের হাত থেকে মানবাত্মার মুক্তির আকাঙ্খা, সম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের শৃঙ্খলিত বিবেককে জাগ্রত করাই ছিল তার জীবন-মন্ত্র।

জীবনার্থের এই বৈশিষ্ট্যই নজরুলের পৌরানিক সাহিত্য-ঐতিহ্য চেতনাকে করেছে মানবমূখী জীবনান্বেষায় ভাস্মর। যখনি আমার স্বপ্নের বাংলায় দক্ষিণা হাওয়া বইতে শুরু করে, ঠিক তখনি অপশক্তি হানা দিয়েছে হাজার বছরের স্মৃতি বিজড়িত আপন কৃষ্টি-কালচারে সমৃদ্ধ সুজলা সুফলা এ বাংলায়। আবার সময় এসেছে নজরুলের সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ষোল কোটি বাঙ্গালীর পাশে দাঁড়াবার। দূর হোক ধর্মান্ধতা এবং উগ্রহায়েনার থাবা থেকে মুক্ত হোক আমার সোনার বাংলা।

আসুন, আমরা সবাই সব ভেদাভেদ ভুলে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নজরুলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমস্বরে গাহি সাম্যের গান–

ইসলাম ধর্ম দাবি নিয়ে ভাবতে শিখায়

মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

নিজেকে বড় মনে না করেই অহংকার মুক্ত থাকা যায় ও আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ হক প্রদান করা যায়। কোন মানুষ যদি বলে আমি আল্লাহ্‌কে ভালবাসি ও বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্‌র পূর্ণ হক আদায় করি, এই দাবীটি কিভাবে প্রমাণিত হবে। শুধু মৌখিক দাবী তো অতি সহজেই করা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দাবীর বাস্তবায়ন বা বাস্তব রূপ দাঁড় করানো অনেক গভীর বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মনোনীত ও মদদপ্রাপ্ত মহামানবগণই পারে তাদের যা দাবী তা বাস্তবরূপে প্রতিফল হিসাবে দাঁড় করানোর রূপ দিতে।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা ইয়াসিনের মধ্যে বলেছেন, তোমরা শয়তানের ফাঁদে পড়োনা বা তার দেখানো পথে চলো না। আমরা কি ভেবে দেখেছি গভীরভাবে যে– আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের মোকাবেলায় আমাদের অবস্থান কিরূপ? আমাদেরকে শয়তানে পেয়েছে না আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথে আছি। ধর্ম মানবজাতিকে উত্তমরূপে পরিবর্তন করতে আসে বা করাতে জারি থাকে। হযরত আদম (আ.)কে প্রেরণ করে বলেছিলেন, হে আদম! তুমি বলে দাও আল্লাহ্ আছেন, যিনি তোমাদেরকে সকল কিছু শিক্ষা দেন। আল্লাহ্‌র পরিচয় যদি না জানে তাহলে মানবজাতি প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ্ কোথায়? আল্লাহ্ কেমন তিনি কি ইত্যাদি। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অসংখ্য জায়গায় বিভিন্নভাবে নিজের পরিচয় সৃষ্টির অনেক কিছুর দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে ধরেছেন। ধাপে ধাপে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ মহা শক্তিধর সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক ও স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। প্রথম দিনই বলেন নি যে, হে মানব! আমি তোমাদের জন্য এতোগুলো আমার পরিচয় প্রদান করছি অথবা আমার আদেশ পাঠাচ্ছি। বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)কে প্রেরণ করে তিনি আল্লাহ্ তাঁর গুণাগুণকে বা তাঁর ইচ্ছাকে অথবা তাঁর কাছে পৌছার ব্যবস্থাপত্র শরীয়তের শিক্ষা প্রেরণ করলেন আর ঘোষণা করলেন যে এই হল আমার ইচ্ছা, এই হল আমার কাছে পৌছার ব্যবস্থাপত্র।

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আঁ হযরত (সা.) পর্যন্ত মানবজাতির জন্য নীতিগত সকল শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-কে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'লা সেই সমস্ত শিক্ষাগুলো স্থায়ী শরীয়তাকারে নাযেল

করলেন। মানুষকে সকল ধরণের শিক্ষা বা ব্যবস্থাপত্র জানালেন। কুরআন শরীফে অসংখ্য জায়গায় তাক্ওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর মানে কি? অসংখ্য অর্থের মধ্যে এটাও একটি যে, মানুষ যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথে চলে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন করে তাহলেই তাক্ওয়ার পথে চলার প্রমাণ বহন করবে। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানার অপর নাম হল মুত্তাকী হওয়া বা তাক্ওয়া অবলম্বন করা। মানুষের সকল যোগ্যতাই আল্লাহ্ তা'লার তরফ হতে এসে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা নিজে যদি ধারণা দেন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্কে ধরা বা লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লার গুণাগুণ বা তাঁর কার্য সদা চলমান। সৃষ্টির সীমা থাকা বা শুরু-শেষ থাকা সৃষ্টির গুণগত কারণ। স্রষ্টার সীমা সৃষ্টির কর্মের ফলস্বরূপ হয়ে থাকে, কিন্তু স্রষ্টার কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

পবিত্র কুরআন করীমের মতো এক মহান গ্রন্থ যদি এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ না হত তাহলে আল্লাহ্ তা'লার এতো উচ্চ ও গভীরতম রহস্য জানা বা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হতো না, আর আখেরী যামানার নির্ধারিত প্রতিনিধি মহানবী (সা.) এর সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইরানী হযরত সালমান ফারসী (রা.) বংশে আগমন না করতেন তাহলে কুরআন শরীফের মত মহানগ্রন্থ বা তাঁর শিক্ষামালা মানবজাতির কাছে পুরোনো কিচ্ছা-কাহিনীর মতো মনে হত, অপর দিকে এ যুগের দিশাহারা, পথহারা, হেদায়াতশূন্য ঐশীনেতা শূন্য মৌলভী-মোল্লাদের দ্বারা আল্লাহর এ বাণী কুরআন এর আয়াত একের পর এক মনসুখ বা রহিত হতে হতে শেষ হয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে শত সহস্র শুকরিয়া ও প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না, যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্যকারী জামা'ত তাঁর পথে কুরআনকে আমরা এমনভাবে ভালোবেসেছি বা উপলব্ধি করতে পেরেছি যেভাবে মায়ের শিক্ষা অনুযায়ী জন্মদাতা বাবাকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। সমস্ত জগত বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তা গৃহিত হয় না। "ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন।" অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কি জিনিস, শুধু কি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কলেমা পাঠ করার নাম। ঠিক আছে এ ৫টি তো ইসলাম ধর্মের খুঁটি বা স্তম্ভ। আর স্তম্ভের ওপরে তো হাজার হাজার অংশ বা শাখা প্রশাখা বা সম্পদ থাকে বা রয়েছে। ঐ আয়াতের অর্থ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যা মনে হয় তা হল এ যুগের আগমনকারী মহামানবের ও তাঁর কায়েম করা জামাতের সাথে এক সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। মসজিদে ইবাদত করেও যেখানে মানুষ হয়ে মানুষের প্রাণ হরণ করা থেকে শুরু করে হেন কাজ নেই যা করা হচ্ছে না। তাহলে ইবাদত অর্থ কি প্রকৃতই আল্লাহ্কে সনাক্ত করা, নবী (সা.) এর মাকাম সনাক্ত করা, মক্কা ও মদীনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দৃঢ়ভাবে ধরা বা গ্রহণ করা, আর যুগের আগমনকারী যুগ ইমামকে গ্রহণ করা, তাঁর শিক্ষা যা কুরআন এর আলোকে মূল্যায়ন করে প্রতি পদক্ষেপে ব্যবহার করা।

ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর কুরআনের শিক্ষা কি? মানবকে মূল্যায়ন করা বা রক্ষা করা নিরাপত্তা দেয়া ও নিরাপদে রাখা। আল্লাহ্র আদেশ, রসূলের আদর্শ, কুরআনের শিক্ষা; ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে সকল মানবজাতির জন্য গ্যারান্টি পত্র বা সনদ। ধর্মের নামে জমিনে নরহত্যা কখন হয়ে থাকে যখন ধর্মের মূল ও প্রকৃত ঐশী কান্ডারী ঐ জাতির নেতৃত্বে থাকে না। আগমনকারী মহামানবকে মান্য করার পরিবর্তে তাঁর বা তাঁর জামাতের ওপর অত্যাচার চালানো হয় তখন জমিনে ধর্মের নামে অধর্ম চলতে থাকে। আজ সারা পৃথিবীতেই ধর্মে আহ্বান শোনা যায়, ধর্মের দোহাই দেয়া কিন্তু ধর্ম যা বলে বা শিক্ষা দিতে চায় তা তো অনেক অনেক দূরের অবস্থান। হযরত আদম (আ.) এর যুগেও অমান্য করা হয়েছে, তখনকার সমাজপতিরা অহংকার করেছে। হযরত নূহ (আ.) এর যুগেও তাঁকে অমান্য করা হয়েছে বা তাঁর জামাতের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, সমকালীন চলমান ধর্মের নামে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যুগেও তাঁর বিরোধীতাকারী তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেই অত্যাচার করেছিল বা অগ্নিতে ফেলেছিল। হযরত লুতের জাতির কথা বলা হয়েছে, হযরত শোয়েবের জাতির কথা বলা হয়েছে আর অত্যাচার যারা করেছিল তারা আল্লাহ্র নবীদের বিপক্ষ দল ছিল। হযরত মূসা (আ.) এর যুগে হামান-ফেরাউন অস্বীকার করেছিল এই বলে যে মূসা আল্লাহ্র নবী নয়। তারা হযরত মূসা (আ.) তাঁর জামাতের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল। হযরত দাউদ (আ.) এর যুগে যারা আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনয়নকারীদের জীবন হরণ করতো তাদের অবস্থান কোথায়। সকল নবী রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ধর্মকে বুঝাতে চেয়েছেন।

আজ পৃথিবীতে ধর্মের নামে যে অত্যাচার অবিচার হচ্ছে তা ইসলাম ধর্ম ও কুরআনের সঙ্গে এর কোন দূরতম সম্পর্ক নেই। একজন মুসলমান হয়ে, ধর্মের নামে মানব হত্যা ও অত্যাচার করে মূলত, তারা ইবলিসের গোলামী করছে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে নমরুদের আদর্শকে বহন করছে। পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম নাযিল হওয়ার পরে নমরুদ হামান, ফেরাউনের এবং আবু জাহলের মত ধর্মদ্রোহীদের নোংরা আদর্শগুলো জিন্দা থাকার কথা ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সহ লক্ষ নবী রসূলের আদর্শই জিন্দা হবার কথা। আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও দয়ায় সেই কাজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে।

ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। পবিত্র ঈদুল আযহা সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।

–সম্পাদক

জাতির নেতা সেবক

মৌলবী এনামুল হক রনি

সেবা করা এক মহৎ কর্ম। মানুষ মানুষের জন্য, স্রষ্টার ভালবাসায় দুঃস্থ অসহায়দের সেবা করবে। সেবার জন্য কোন বিনিময় হয় না। মানুষের মন থেকে যে অকৃত্রিম ভালবাসা উদ্বেলিত হয় তারই বর্হিপ্রকাশ সেবাদান। যে যত বেশী সেবা করতে পারে সে ততো মহান হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ইন্নাকা আলা খুলুকীন আযীম। অর্থঃ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত (সূরা কালাম ঃ ৫)। যে সকল পুত-পবিত্র ও নৈতিক গুণাবলী উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ও সমাবেশ একজন মহামানবকে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে, এর সবটাই মহানবী (সা.) এর মাঝে সন্নিবিষ্ট ছিল। তাই তাঁর (সা.) এর সেবার মান বা আদর্শ আমাদের সকলের জন্য পাথেয়।

তিনি (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের জাতীর নেতা তোমাদের সেবক।' যে যত বেশী খেদমত করতে পারবে সে ততো বড় নেতা হতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নিজ হাতে কাজ করেছেন। কোন সময় কাজকে অবজ্ঞা করে নাই। এক সফরে সবার মধ্যে যখন কাজ ভাগ করা হচ্ছিল তখন সবচেয়ে কঠিন কাজটি রসূল করীম (সা.) চেয়ে নিয়েছিলেন আর তা হলো পানি সংগ্রহ করা ও লাকড়ী (জ্বালানী) সংগ্রহ করার কাজ। রসূল করীম (সা.) এর খাদেম হিসেবে হযরত যায়েদ (রা.), আনাস (রা.) ছিলেন। তারা একথা বলেছে যে, তাদের সাথে রসূল করীম (সা.) কাজ করতেন। কে বেশী কাজ করতেন একথা বলতে গিয়ে তারা বর্ণনা করেছেন, মনে হয় আমাদের চেয়ে তিনি (সা.) বেশী কাজ করে দিতেন।

কথাই বলে 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে জন'। যিনি শাসন করবেন তার মাঝে আদার ভালোবাসা বা মহব্বতপূর্ণ বিনয়ী ভাব না থাকলে শাসক হয় কি রূপে? তাই শাসক বা কর্মকর্তা হওয়ার জন্য সেবার মন-মানসিকতা ও ভালবাসা থাকা চাই। একজন কর্মকর্তা হিসাবে তার আচার-আচরণ অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে। যা 'সবার তরে ভালবাসা, ঘৃণা নহে কারো পরে।' এই ব্রত নিয়ে সকলকে ভালবাসা দিয়ে মন জয় করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ কাজ করে যাবে। আর এ কাজের খোদাভীতি ও তাক্ওয়া অর্জন করতে হবে। যতবেশী তাক্ওয়া লাভ হবে ততবেশী সেবাদান যোগ্যতা অর্জনকারী হবে। মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তোমাদের মাঝে (সদা) এমন এক জামা'ত, থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায় সংঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হতে নিষেধ করবে, বস্তুতঃ এরাই সফলকাম হবে" (আল ইমরান ঃ ১০৫)। এ আয়াত দ্বারা একটি জামা'ত ও তাদের কাজ কি, তা সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জামা'ত বা সমবেত শক্তির মাধ্যমে জাতির উন্নতির জন্য কাজ করা উচিত। আর কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে কল্যাণের জন্য যেন কাজ করা হয়। কোনক্রমেই অকল্যাণ হতে পারে এমন কাজ যেন করা না হয়, আর এসব ন্যায়সঙ্গত কাজ করার জন্য পরস্পরের মাঝে প্রতিযোগিতার স্পৃহা থাকা দরকার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে (খোদা তা'লার) নৈকটলাভের মাঠ শূন্য। সকল জাতি সংসারর প্রেমে মত্ত। যদ্বারা খোদা সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর তৎপ্রতি কোন লক্ষ্য নাই। যারা পূর্ণ উদ্যম সহকারে এই দ্বারে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য নিজেদের সদগুণের পরিচ দেবার এবং খোদার নিকট হতে বিশেষ পুরস্কার লাভের ইহাই সুযোগ। (আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা-২০)।

পূণ্য অর্জনের মাঠ শূন্য হলেও কোন এক পক্ষকে অবশ্যই সে মাঠে উপস্থিত হতে হবে। আর একটি জামা'ত যদি দাঁড়িয়ে যায় তবে তারা এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে। আর এ জামা'ত হতে হবে খোদার দৃষ্টিতে প্রিয় বা যোগ্যতার অধিকারী। এখন খোদা কাদের কে যোগ্যতাও মর্যাদা প্রদান করেছেন, তা জানা দরকার। আল্লাহ্ পাক এর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো মুত্তাকীগণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন- 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী' (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪)। এখন আয়াতে মুত্তাকী করা হতে পারবে এ বিষয়ে জানা দরকার পবিত্র কুরআন অনুযায়ী মুত্তাকী হলো তারা, 'যারা গায়েবের ওপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং (আল্লাহ্ বলেন) আমরা তাহাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছি তাহা হইতে খরচ করে' (সূরা বাকারা ঃ ৪)। মুত্তাকীগণ খোদাভীতি অর্জন করে তাঁরই সন্তুষ্টিতে ইবাদত ও দান-খয়রাতে অগ্রগামী হয়ে থাকে। আর নিজে এবং অন্যদের কল্যাণকামী হয়ে থাকে। একদিকে নিজেকে খোদার নৈকট্যলাভে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। অপরদিকে খোদার সন্তুষ্টিতে মানব কল্যানে ব্যয় করে। কোন সময়ে শ্রম দিয়ে, কোন সময় পরামর্শ দিয়ে, কোন সময় সম্পদ ও আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে। এ কারণে আল্লাহ্‌র কাজ করার জন্য আল্লাহ্ বেছে নেন আল্লাহ্‌র মুত্তাকী বান্দাদের।

আল্লাহ্‌র কাজ করেন নবী-রসূলগণ আর তাঁর সাথী হন সেই সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা যারা তাঁকে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী জামা'ত এর উত্তরসূরী হয়ে থাকেন। তারা ও এ কল্যাণধারা পেতে থাকে, কারণ যে ঝর্ণাধারা নবুওয়ত থেকে জারী হয় তা খেলাফত দ্বারা প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহমান থাকে। এই প্রবহমান প্রস্রবনে যারা চুমুক দেয় তারাও পরিতৃপ্ত হয়। আমরা সে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্য করার কারণে। আমাদের উচিত সে সমস্ত দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। সে দায়িত্ব ছোট

বড় যাই হোক না কেন।

পবিত্র কুরআনে মসজিদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'কেবল সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে, যে আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না, অতএব অচিরেই এই সকল লোক হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরা তওবা ঃ ১৮)।

মসজিদের দায়িত্ব পালনের মধ্যে মূলতঃ একটি জামাতের দায়িত্ব পালন নিহিত। কেননা একটি মসজিদকে আবাদ করা, মসজিদ এর মুসল্লিদের দ্বারা মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধন করা, মসজিদে যারা যারা আগমন করবে তাদের সাদর সম্ভাসন জানানো সবই একজন মু'মিন মুত্তাকীর কাজের অংশ। এ যাগ্যতা অর্জন করতে হলে বা এসব সেবা প্রদান করার জন্য নিজেকে সর্বপ্রথম প্রস্তুত করতে হবে। শুধু মুখে মুখে আল্লাহ্‌র ও পরকালের প্রতি ঈমানের দাবি করলে হবে না। কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ থাকতে হবে। যেভাবে সূরা সাফে বর্ণিত হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছো তোমরা কেন তা বলো যা করো না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা যা বলো তা করো না" (সূরা সাফ ঃ ৩-৪)। আর অপর একটি আয়াতে আরো সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছে- "তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের উপদেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও" (সূরা বাকারা ঃ ৪৫)।

নিজ আমল জরুরী, নিজের আমল না করে অন্যকে উপদেশ দিলে এটা হবে অন্যায়। কারণ আমি পরীক্ষিত না হয়ে এটা অন্যকে কিভাবে বলতে পারি? তাই নিজেকে যাচাই বাছাই করে ভাল ফলের নিশ্চয়তা লাভ করে তারপর অন্যকে পরামর্শ দিলে উভয়ের জন্য কল্যাণ হবে। কারণ নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে কোন ভাল কথা বলে দেয় তদনুযায়ী যে কাজ হবে, তার সওয়াব সে ও পাবে' (মুসলিম ও আবুদাউদ)।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের অধিকাংশের পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই– কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান খয়রাত করে অথবা সৎকাজ করে অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তা করে অচিরেই আমরা তাকে মহাপুরস্কার দান করবো' (সূরা আন্ নিসা ঃ ১১৫)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় পরামর্শ দানাকারীর জন্য যোগ্যতার দরকার হয়। আর তা হলো প্রথমঃ দান-খয়রাতকারী, সদকা দাতা, চাঁদা দাতা হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সৎকাজ অর্থাৎ নেক আমলকারী বা সময়োপযোগী আমলকারী হতে হবে যাকে বলা হয় আমলে সালেহকারী। তৃতীয়তঃ পরস্পরের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি নিজে শান্তি প্রিয় না হয় তবে ইসলাহকারী বা সংশোধনকারী কি রূপে হবে। আর এসব গুণাবলী কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হাসিল করতে হবে। তাই জামাতের কাজের জন্য যারা মনোনীত হয় তাদের মাঝে ও এ সকল গুণাবলী থাকা জরুরী।

সৈয়্যদনা হুযূর (আই.) তাঁর জুমুআর খুতবায় বলেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা উচিত, নিজের নফসকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত, নিজের শক্তি-বৃত্তি বা শক্তি-সামর্থ্যকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত। যদি শক্তি এবং সামর্থ্যের সঠিক ব্যবহার করতে হয় তাহলে এসবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর। আর এটিই সেই তাক্ওয়া যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান।....পুনরায় তিনি (আ.) বলেন; যদি জামা'তভুক্ত হয়ে থাক, ইসলামের সেবা যদি করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাক্ওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন কর। শুধু কথার খৈ ফুটিয়ে ইসলামের সেবা সম্ভব নয় এবং আমাদের তাক্ওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক"(হুযূর আই. খুতবা জুমা' ১০ জুন ২০১৬ইং)। হুযূর (আ.) ইসলামের সেবাদান করার জন্য নিজেকে তাক্ওয়াশীল ও পবিত্রতা অর্জন করতে বলেছেন। তিনি (আ.) বলেন, তাক্ওয়া অবলম্বন কর। তাক্ওয়া সব কিছুর মূল। তাক্ওয়া শব্দের অর্থ হলো প্রতিটি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পাপের বিচরণস্থল এড়িয়ে চলা। কেননা তাক্ওয়া হলো যে বিষয়ে সন্দেহ হয় যে, এটি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাও এড়িয়ে চলা।....তাক্ওয়াশীলদের জন্য শর্ত হলো তারা যেন নিজেদের জীবন দীনহীন ভাবে অতিবাহিত করে। এটি তাক্ওয়ারই একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদের অনর্থক রাগ এবং ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে।

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেছেন, এটি পরিহার কর। অনেকেই বড়দের সাথে সাক্ষাতে পরম বিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু বড় সে যে দীনহীনদের কথাও দীনতার সাথে শুনে, তাদের মন জয় করে এবং তাদের কথাকে সম্মান করে। ব্যঙ্গ বা উপহাস মূলক কোন কথা উচ্চারণ করে না যার ফলে কেউ দুঃখ পায়।

এসব স্থানে একজন সেবকের বিনয়ী হওয়া, তাক্ওয়াশীল হওয়া, পবিত্র পরিবর্তন হওয়ার গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি (আ.) আরো বলেন; আমি পূর্বেও বলেছি, যদি ইসলামের সমর্থন এবং সেবা করতে চাও তাহলে প্রথমে নিজে তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর পবিত্র হও যার কল্যাণে তোমরা খোদা তা'লার আশ্রয়ের দুর্ভেদ্যদূর্গে আসতে পারবে এবং যার ফলে তোমরা সেবার সেই সম্মান এবং যোগ্যতা লাভ করবে। [হুযূর (আই.)-এর খুতবা জুমা'-১০ জুন ২০১৬)।

হুযূর (আই.) অন্যত্র বলেছেন. ".... এছাড়া ওহদাদার বা পদাধিকারীদের ও যাদের ওপর মানুষের দৃষ্টি রয়েছে এবং মানুষ তাদেরকে নির্বাচনই করেছে এজন্য যে, আমাদের মাঝে তারা সর্বোত্তম, একটি আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত" (খুতবা জুমা'-২৪ জুন ২০১৬)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, 'হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময় এই সময়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হতে আসিবে না।" (কিশতিয়ে নূহ ১০২ পৃষ্ঠা)

তাই এ সময় কাজের মাধ্যমে সচল করা প্রত্যেক কর্মীর জন্য আবশ্যক। কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, নিঃস্বার্থভাবে। যেভাবে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-লিখেন, 'খেদমতে দীনকো এক ফযলে ইলাহী জানো ইসকে বদলে মে কভি তালেবে ইনয়াম না হো।' অর্থঃ দীনের খেদমত করাকেব আল্লাহ্ তা'লার একটা ফযল মনে করবে ইহার বিনিময়ে পুরস্কারের আশায় থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ধর্মের খেদমতহ করাকে সুযোগ দিন। (আমীন)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৫০তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৫০তম সালানা জলসা গত ১২, ১৩ ও ১৪ আগষ্ট, ২০১৬ লন্ডনের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) জলসার প্রথম দিন শুক্রবারের জুমুআর খুতবায় জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগত মেহমানগণের সেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন করেন। তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীগণের নিকট যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন আল্লাহ্ তা'লা করুন এই জলসায় আগমনকারী প্রত্যেকেই যেন তা পুরোপুরি পালন করে লাভবান হতে পারেন।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রত্যেক আহমদী এটি জানে এবং জানা উচিত আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বিশেষভাবে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এই জলসায় অংশগ্রহণ করা জাগতিক কোন মেলায় অংশগ্রহণ করার মত নয়। অতএব এই দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন কেবল ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, এর ব্যতিক্রমে সেসব লোকদের প্রতি তিনি (আ.) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা জাগতিক সমাবেশের মতই চিন্তাধারা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করে।

জলসায় আগমনকারীরা যেন জলসা গাহ্-তে বসে নীরবে মনোযোগের সাথে জলসার অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন এবং জলসা না শুনে বাইরে কোন ধরণের অযথা খোশগল্পে কেউই যেন মেতে না থাকেন এই বিষয়েও হুযূর (আই.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, জলসার বক্তৃতাগুলো অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে বক্তাগণ সযত্নে তৈরী করেন। তাই প্রত্যেকের এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, মনোযোগ দিয়ে তা যেন শোনা হয় এবং যথারীতি মনেও রাখা হয়। আমি মনে করি কোন পুরুষ বা মহিলা এসব বক্তৃতার অর্ধেকও যদি স্মৃতিপটে রাখেন তবে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মানকে তারা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

এ বিষয়ে হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন, যেখানে তিনি (আই.) বলেন, প্রত্যেকের মনোযোগের সাথে বক্তৃতামালা শ্রবণ করা উচিত।

এরপর হুযূর (আই.) জাগতিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবার জন্য দিনরাত নিবেদিতভাবে যে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এ বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

বিকাল বেলা হুযূর (আই.)-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। এরপর ফার্সি ও উর্দূ নযম পাঠ করা হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে হযরত আমীরুল মু'মিনীন বলেন, এ বছর ইউকে জামা'ত জলসাকে এ কারণে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে- বলা হচ্ছে, এটি ইউকে জামা'ত-এর ৫০তম সালানা জলসা।

হুযূর (আই.) বলেন, জাগতিক লোকেরা ৫০ বছর হলে গোল্ডেন জুবিলী পালন করে, হৈ-হোল্লোর, আনন্দ উৎসব ইত্যাদি করে থাকে। ঐশী জামাতের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। এ জামা'ত দেখে যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন, তা বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার যে উদ্দেশ্য বলেছেন সেটা আমরা অর্জন করেছি কিনা?

হুযূর (আই.) আরো বলেন, আজকাল ব্রাজিলে অলম্পিক হচ্ছে। সেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে। অথচ তাদের অনেক নাগরিক দরিদ্র। কয়েকদিনের আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যাপক খরচ হচ্ছে। সাময়িক অনেক কিছু বানানো হচ্ছে, যেগুলো কয়েক দিন কাজে লাগবে। এমন কিছু আছে যা এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে না। অলম্পিকের অভিজ্ঞতা হলো মনে করা হয় এতে লাভ হবে, কিন্তু বাস্তবে যা খরচ হয় তা উঠে না।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা একজন মহাপুরুষ প্রেরণ করেছেন। যাঁর হাতে বয়আত করে আমরা অঙ্গীকার করেছি, নেকির পথে থাকবো, অন্যায়ের পথ ত্যাগ করবো, আমরা রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পড়বো। আমরা মানুষের অধিকার হরণ করবো না।

হুযূর (আই.) বলেন, তরবিয়ত ক্যাম্প প্রয়োজন, আর এ উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার ব্যবস্থা করেছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মানার মূল উদ্দেশ্য হলো তাক্ওয়ায় উন্নতি লাভ করা।

.....আমাদের জলসার কোন জাগতিক উদ্দেশ্য নেই। কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা রাখা উচিত নয়, কাউকে কষ্ট দেয়া উচিত। শত্রুর জন্য দোয়া করা রসূল (সা.) এর শিক্ষা। এর ফলে হযরত উমর (রা.) বয়আত করেছেন। .....আমাদের বড় মনের পরিচয় দেয়া উচিত। শত্রুর জন্য দোয়া করা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, মুসলমান সে যে নিজের সবকিছু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে। হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার মান এতটা হওয়া উচিত লোকেরা যেন তাকে দেখে বুঝে সে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে।

হুযূর (আই.) বলেন, নামায খোদার সন্তুষ্টির জন্য পড়া উচিত, কারো ভয়ে নয়। কাউকে দেখানোর জন্য নয়। আনুগত্যের নামায পড়তে হবে। বান্দার অধিকার প্রদানের শিক্ষাও আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সামনে রেখে দিতে। সূরা ফাতেহাতে যে গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে– বান্দার সেগুলো রপ্ত করা উচিত।

জামা'ত তখনই জামা'ত হয়, যখন পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ভ্রাতৃত্ববোধ বিরাজমান থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, ভালো বীজ কেউ নষ্ট করতে পারে না। তদ্রূপ জামাতের ক্ষেত্রেও। যা আল্লাহ্‌র জামা'ত সেটাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এটা উন্নতি লাভ করে।

হুযূর (আই.) বলেন, তাওয়ায়ানু আলাল বিররে ওয়াততাক্ওয়া অর্থাৎ- তোমরা পুণ্য ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা কর। হুযূর (আই.) বলেন, কুরআনের শিক্ষা হলো- দুর্বলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত।..... কুরআনের শিক্ষা ষোলআনা শিরোধার্য করা উচিত। আল্লাহ্ ও রসূলের কথা মেনে চলা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও নির্যাতন করে। বর্বরতা করে। তারা ইসলামকে বুঝে না।

কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার বিষয়টিও বলেন। হুযূর (আই.) বলেন, কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর অনুগ্রহ করেছে। তাদের কাহিনীকে বাস্তবে রূপ দান করেছে।

হুযূর (আই.) বলেন, কুরআনের মর্ম না বুঝা পর্যন্ত আলো সৃষ্টি হতে পারে না।

হুযূর (আই.) বলেন, এ জামাতের যারা অন্তর্ভুক্ত হয় তারা ওয়া আখারিনা মিনহুম এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। নিজেদের মাঝে পুত পবিত্র পরিবর্তন করা আবশ্যক।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশ শুরু হয় ১৩ আগষ্ট বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায়।

শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। এতে বয়াতের শর্তসমূহ প্রতিপালনে ব্যবহারিক নমুনার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– মি. বিলাল এ্যাটকিন্সন, রিজিওনাল আমীর, নর্থ-ইষ্ট, যুক্তরাজ্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনে মহানবী (সা.)-এর মহান সুন্নত অনুসরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন, মুফতি সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া, রাবওয়া।

আহমদীয়া খিলাফত'-এর শতবর্ষ পূর্তিতে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে আমাদের দায়বদ্ধতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– মওলানা সৈয়্যদ মুবাশ্বের আহমদ আইয়ায, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়া

মহিলা জলসাগাহে হুযূর (আই.)-এর শুভাগমন ও লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন ১৩ আগষ্ট বিকাল ৫ টায়।

কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতার জন্য কৃতি ছাত্রীদের মাঝে সনদ ও মেডেল প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, ইসলামের শিক্ষায় নর-নারীর মাঝে কোন ধরনের প্রভেদ করা হয় নি। এমন শিক্ষা অন্য কোন ধর্মে নেই। মু'মিন নর-নারী উভয়কে চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পুরুষ যে পুরস্কার পাবে, মহিলারাও একই পুরস্কার পাবে। আলাদা করা হয় নি। মু'মিন বললেও উভয়কেই বুঝায়।

হুযূর (আই.) বলেন, আজকাল যারা আপত্তি করে, আপত্তিকারীদের সব আপত্তির খন্ডন কুরআনে রয়েছে। কুরআনের পূর্বে এমনভাবে নারীর অধিকার অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নি। হুযূর আরো বলেন, এ বিষয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন করে থাকেন। এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন আপনি কি মনে করেন, খৃষ্ট ধর্মের বিধানে যেভাবে বিভিন্ন সময়ে আইন কানুনে পরিবর্তন এসেছে এভাবে কুরআনেও আসবে? আমি তাকে বললাম, না, এমন কোন পরিবর্তন কুরআনে হবে না । হুযূর (আই.) বলেন, চ্যানেল ৪-এর একজন মহিলা সাংবাদিক ছিল। সে প্রশ্ন তুলে মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা কেন? আমাদের পক্ষ থেকে তাকে উত্তর দেয়া হয়। তারপরও সে বলতে থাকে তাহলে তোমরাও তো অন্যদের মত কট্টর । আমি বললাম, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মহিলারা দিবে। উত্তর দেয়া হয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, দুনিয়ার মানুষ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে ধর্মে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।.... সহানুভূতির নামে-স্বাধীনতার নামে বরং মহিলাদের পদদলিত করা হয়েছে।..... গত বছর এক মহিলা লেখিকা এসেছিলেন। তিনি সারাদিন মহিলাদের সাথে ছিলেন। আর স্বীকার করেছেন, আমি সারাদিন মহিলাদের সাথে থেকেই বেশি সাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা বোধ করেছি।

হুযূর (আই.) বলেন, একজন লেখিকা লিখেছেন, পুরুষরা আমাদের তাদের নোংরা উদ্দেশ্যে চায়, আমরা যেন আমাদের কাপড় খুলে ফেলে উলংগ হই।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আ.) একবার হযরত আম্মাজানের সাথে রেলষ্টেশনে পায়চারি করছিলেন। হযরত আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়ালকে বললেন– এমন করতে হুযূরকে বারণ করুন। অন্যরা এমনটা দেখে মন্দ বলবে। আওয়াল (রা.) বললেন, এ প্রশ্ন তোমরা মাথায় এসেছে। তুমি গিয়ে বল। তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে একই প্রশ্ন করলেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুনার পর বললেন, কি বলবে? মির্যা গোলাম আহমদ তার স্ত্রী সাথে পায়চারি করছে, কথা বলছে। এটা বলবে, বলতে দাও।

হুযূর (আই.) বলেন, একবার এক সাহাবী রসূল (সা.)কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সেবার সবচে বেশি প্রাপ্য কে? রসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। তারপর জিজ্ঞেস করলে কে? রসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। এবাবে তিনবার মায়ের কথা বললেন। চতুর্থবার পিতার কথা বললেন।

হুযূর (আই.) বলেন, অন্য এক হাদীসে রসূল (সা.) বললেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে, এতো সম্মান ইসলাম মহিলাদের দিয়েছে।

তৃতীয় অধিবেশন

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় রাত ৮.৪৫ মিনিটে।

প্রথমে আমন্ত্রিত বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) গত এক বছরে বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের অগ্রগতির এক ঝলক তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) বলেন, □ ঃ (সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো)

* এ বছর নতুন একটি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশটি হল প্যারাগুয়ে। মোট ২০৯ টি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩২ বছরে ১১৮ টি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া কমোরো আইল্যান্ড, উত্তর আমেরিকার একটি দেশ সেখানেও এ বছর কয়েক জন বয়আত গ্রহণ করেছেন।

* ৪৯ টি দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে নওমোবাঈনদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

* এ বছর ৭২১ টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৯৬৪ টি স্থানে প্রথমবারের মত জামাতের চারা রোপিত হয়েছে।

* নতুন মসজিদ ২৯৯ টি। এর মধ্যে নতুন নির্মিত ১২০টি পূর্বের-নির্মিত ১৭৯ টি। ব্রাজিল ও জাপানে নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

* এবছর ১২১টি মিশন হাউজ নতুন নির্মিত হয়েছে।

* ৪৫০টি নতুন তবলীগি প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* ১২৬ টি দেশে মোট ৮৯১ টি নতুন বই প্রকাশ হয়েছে।

* ফোল্ডার ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ছাপানো হয়েছে।

* ১ কোটি ৪২ লক্ষ লিফলেট প্রচার হয়েছে। ২ কোটি ৯৬ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম

* এ বছর ৩৪৮টি নতুন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১০৩ জেলায় ভারতের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

* ৫৮০ টি বইমেলায় জামা'ত অংশ গ্রহণ করেছে।

* আরবি ডেস্ক ১১৭ টি বই ছাপিয়েছে।

* বাংলা ডেস্ক বারাহীনে আহমদীয়া ৪ খন্ডের অনুবাদ করেছে। খুতবা প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান ইত্যাদি হচ্ছে Live সত্যের সন্ধানে প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৫৮ জন বয়আত করেছে।

* এ বছর ৮৫ টি প্রেস রিলিজ প্রচারিত হয়েছে।

* আল ইসলাম (alislam.org) ৪৭ টি ভাষায় ব্রাউজিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, ১৮ টি ভাষায় (অডিও ভিডিও) হুযূরের খুতবা রয়েছে।

ঘানাতে এমটি-এ-এর উন্নত মানের এক স্টুডিও বানানো হয়েছে।

* নুসরাত জাহা স্কীম : ৩৬ হাসপাতাল, ৫টি হোমিও হাসপাতাল আফ্রিকাতে কাজ করে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ৪১ জন ডাক্তার ১৫ জন স্থানীয় ডাক্তার কাজ করে যাচ্ছে।

* আফ্রিকার ৮ টি দেশে ১৬টি মডেল ভিলেজ স্থাপন হয়েছে।

* হিউমিনিটি ফাষ্ট ৪৯ টি দেশে রেজিষ্ট্রি হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বেনিন প্রভৃতি দেশে ফ্রি মেডিকেল টিম হয়েছে :

* ১৯ হাজার ৭ শত জন নও মোবাইন-এর সাথে যোগাযোগ হয়েছে।

* এ বছর সারা বিশ্বে ৫,৮৪,৩৮৩ জন বয়আত করেছে। ২৩০৩ জাতির লোক এর অন্তর্ভুক্ত।

জলসার দ্বিতীয় দিনে হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বর্ণিত ঈমান উদ্দীপক কয়েকটি ঘটনাঃ

স্বপ্নের মাধ্যমে পথ নির্দেশনা লাভ এবং এমটিএ-এর মাধ্যমে বয়আত

সিরিয়ার এক জন মহিলা বলেন আমি আহমদী হওয়ার পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যা আমার মনে আছে। আমি স্বপ্নে একটি উজ্জল লাল রং-এর নৌকা দেখতে পাই যাতে লোকজন খোসগল্পে মত্ত ছিল। আমি দেখলাম, এই নৌকাটি ধিরে ধিরে ডুবে যাচ্ছে। আর এর যাত্রীরা সে সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এমন সময় আমি একজন বুজর্গকে দেখতে পাই যিনি পাগড়ী এবং কোট পরিহিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, যদি এখনও তুমি বুঝতে না পার তাহলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। তিনি বলেন, আমি বেশ কয়েকবার তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আমার কি বুঝা উচিত, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নি। আমি এই স্বপ্নের কিছুই বুঝতে পারিনি। একদিন আমার এক বোন ফোন করে আমাকে এমটিএ দেখতে বলে, আমি প্রথমে অস্বীকার করি কিন্তু তার জোর করার কারণে এমটিএ দেখতে থাকি। এরপর এমন হয়, আমি এই চ্যানেল দেখে এতে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়াদী সম্পর্কে আমার বোনের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতাম। যাহোক, এমটিএ আমার কাছে ভাল লাগে কিন্তু আমি এটি আমার স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে দেখতাম। তাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানই দেখতে পারতাম। এই অনুষ্ঠানগুলো দেখার পর আমি এটি অনুভব করি আমার হৃদয় প্রশান্ত হতে শুরু করে। কিন্তু আমি এটি জানতাম না, নিয়তি আমার জন্য অনেক বড় চমক লুকিয়ে রেখেছে। একদিন আমার বোন আমাকে ফোন করে এমটিএ-এর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান দেখতে বলে, আমি এমটিএ অন করা মাত্রই টিভি পর্দায় একটি ছবি দেখে আমার শরীরে কাপুনী এসে যায়, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং আবেগের আতিসহ্যে শরীর কাপতে থাকে কেননা এটি সেই ব্যক্তিরই ছবি ছিল যাকে আমি পাঁচ বছর পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলাম। যিনি আমাকে বলেছিলেন, যদি এখনও তুমি বুঝতে না পার তাহলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। ওফাতে মসীহ এবং ইমাম মাহদীর আগমণ সংক্রান্ত

বিষয়াদী তো আমি আগেই শুনেছিলাম। তাই এ ছবি দেখা মাত্রই হুযূর (আ.)-এর সত্যতা আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আমার স্বামীর বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি বয়আত করি।

* ঘানার ওয়েস্টার্ন রিজিওন থেকে একজন অ-আহমদী লিখেন আমি আপনাদের জামাতের প্রোগ্রাম আগ্রহের সাথে দেখি। আমার মতে ইসলামে জামাতে আহমদীয়াই সেই একমাত্র ফের্কা যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করে। আমি আরো অনেক ফের্কার প্রোগ্রামও দেখেছি কিন্তু যে শিক্ষা আপনারা উপস্থাপন করেন সেটাই প্রকৃত শিক্ষা। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমিও আপনাদের জামাতের সদস্য হয়ে যাব।

* একজন খ্রিষ্টান ঘানা থেকে লিখেন, আমি ধর্মের দিক দিয়ে খ্রিষ্টান আর অধিকাংশ খ্রিষ্টান ও মুসলিম দেশে যেই সব ঘটনা ঘটছে তার কারণে ইসলামকে ঘৃণা করতাম কিন্তু আপনাদের প্রোগ্রাম দেখে আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারি– ইসলাম তো কোন প্রকার সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয় না। এখন কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে আমি ইসলামের সপক্ষে কথা বলি।

রেডিও-এর অনুষ্ঠান শুনে বয়আত

* কঙ্গোর কিনশাসা থেকে একজন নও মোবাঈন রমজান সাহেব লিখেন, আমি প্রথমে মনে করতাম- আহমদীয়া জামা'তও একটি সন্ত্রাসী জামা'ত যাদের বিশ্বাস হল জামাতে প্রবেশের জন্য নিজের রক্ত দিয়ে বয়আত লিখতে হয়, কিন্তু রেডিওতে আপনাদের প্রোগ্রাম শুনে এবং আজ জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি কসম খেয়ে বলছি, আজ থেকে আমি আহমদীয়াতের একজন সিপাহী।

কঙ্গোর ব্রাজভিল থেকে মোয়াল্লেম দাউদ সাহেব লিখেন, আমরা নিজেদের এলাকায় রেডিও-তে জিহাদের ওপর একটি প্রোগ্রাম করি। প্রোগ্রামের পরপরই এক অআহমদী বন্ধু আমাদের ফোন করে বলেন যে, আমরা আপনাদের প্রোগ্রাম শুনেছি এটি আমাদের খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু আমরা একটি জিনিস বুঝতে পারি নি, আমরা টিভিতে ইসলাম সম্পর্কে এক রকম দেখতে পাই আর আপনারা ভিন্ন কিছু বলছেন। আপনারা আমাদের গ্রামে আসুন এবং আমাদেরকে এটা বুঝান। অতএব প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা তাদের গ্রামে যাই যা ৬০ কি.মি দূরে ছিল। সেই ব্যক্তি আমাদের খুব ভালভাবে স্বাগত জানায় এবং নিজ গ্রামের লোকদের নিয়ে আসে। তারা ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জানার ছিল তা জানতে চায়। অতএব আমরা সেখানে জিহাদ সম্পর্কে জামাতের এবং ইসলামের অবস্থান ও শিক্ষা সম্পর্কে তুলে ধরি এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষাও বর্ণনা করি। এর ফলে তিনিসহ ৩০জন সেখানে বয়আত করে।

চতুর্থ অধিবেশন

জলসার চতুর্থ অবিবেশন শুরু হয় ১৪ আগষ্ট বেলা ৩টায়।

কুরআন তেলাওয়াত ও উর্দু নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। প্রথমেই 'একটি মিথ্যা আপত্তি সন্ত্রাসের পক্ষে কুরআন-এর অপনোদনে' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডা. ইজায-উর রহমান, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, ইউকে। এরপর আহমদী শহীদদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী, বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডা. আব্দুল খালিক খালিদ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, পাকিস্তান। এরপর আমাদের খোদা চিরঞ্জীব খোদা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন–মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, মিশনারী ইনচার্জ, ইউকে, ইমাম ফযল মসজিদ, লন্ডন। এরপর অমুসলিমদের সাথে মহানবী (সা.) এর উত্তম আচার ব্যবহার, এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রফিক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইউকে।

আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৬:০০টায়

এক পরম আবেগঘন পরিবেশে প্রায় ৪০ হাজার সৌভাগ্যবান আহমদী এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের চেয়ে প্রিয় খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আত করেছেন। এছাড়া সারা বিশ্বে টিভি-ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে কোটি কোটি আহমদী এ বয়আত করার সুযোগ পেয়েছেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় রাত ৮টায়।

প্রথমে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

এরপর কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠের পর শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কৃতি ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

হুযূর (আই.) সমাপনী ভাষণে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সদস্যদের শান্তি, নিরাপত্তার জন্য ও অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছে আদল, ইহসান ও ইতায়িযিল কুরবা।..... এ বিষয়গুলো গত বছরের শেষ বক্তৃতায়ও আমি উল্লেখ করেছিলাম।

হুযূর (আই.) বলেন, নাস্তিকরা বলে– ধর্মের কারণে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে।.....বিশেষ করে মুসলিম দেশে ধর্মের নামে যে বিশৃংখলা হচ্ছে। এ থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে– ইসলাম হচ্ছে বিশৃংখলা সৃষ্টির মূল কারণ।

হুযূর (আই.) বলেন, অন্য ধর্মের মাঝে খৃষ্টান। তাদের মান্যকারী সংখ্যার দিক থেকে সবচে বেশি। আর তাদের অধিকাংশ উন্নত দেশে। আর তাদের প্রায় ৮০ ভাগের ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হুযূর (আই.) বলেন, যারা বলে- ইসলাম ধর্মের কারণে জগতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। আমি তাদের বলেছি- কোন ধর্মের কারণে নয়। ধর্মে বিকৃতি সৃষ্টির কারণে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, এ বিকৃতি যখন সৃষ্টি হয় তখনই খোদা তা'লা নবীদের প্রেরণ করেন। কুরআন সর্বশেষ শরীয়ত। এটা মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। .....এর ব্যাখ্যা ও তফসীরের জন্য আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদী প্রেরিত হয়েছেন। .....পবিত্র কুরআনের সূরা রূম এর ৪২ নম্বর উপস্থাপন করে বলেন, যখন জল ও স্থলে বিশংখলা দেখা দিলো তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) আসলেন। আর সত্যিকার অর্থে তিনি এসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন। তারা শান্তি ছড়ালেন। এরপর আবার অশান্তি নেমে আসে। আবার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহ্দীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি এসে আবার ইসলামী প্রকৃত শান্তিকে পুন:প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই শান্তি ও নিরাপত্তা আজ ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করার মাধ্যমে আসবে। এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে শিক্ষা দিয়েছেন এর ওপর আমল করতে হবে। ...আমরা আহমদীরা তাঁর আহ্বান শুনেছি। এই মহান শিক্ষাকে মান্য করেছি। ...আমরা জানি ইসলাম প্রত্যেক স্তরে ও প্রত্যেক স্থানে শান্তির শিক্ষা দেয়।

এরপর হুযূর (আই.) ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে নিয়ে পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জতিক

পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করার ফলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, ইসলামে পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।... পিতামাতার অনুগ্রহের কোন প্রতিদান দেয়া যেতে পারে না। তাঁদের সাথে কোমল ও সম্মানের ব্যবহার করা উচিত।...

হুযূর (আই.) বলেন, উন্নত বিশ্বে বাচ্চারা সভ্যতার নামে পিতামাতাকে সময় দেয় না, দেখা সাক্ষাৎ করে না। বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দেয়। বৃদ্ধাশ্রমে তাদের অনেক কষ্টে কাটে। তখন তাদের কাছে জীবনটা দুর্বিসহ মনে হয়। মৃত্যুর প্রহর তারা গুণতে থাকে।

.....এজন্য বৃদ্ধারা আজ আত্মহত্যা করছে। এ সংবাদ আজ পত্র-পত্রিকাতে আসছে।

হুযূর (আই.) বলেন, খোদাকে চিনা ছাড়া না ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। পিতামাতর অধিকার আদায় হতে পারে না। হুযূর (আই.) বলেন, কোন বাচ্চার পিতা যদি তার মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে। এর ফলে মা যদি বাচ্চার দিকে মনোযোগ না দিতে পারে এর ফলে বাচ্চা যদি নষ্ট হয় তাহলে এটা বাচ্চাকে হত্যার নামান্তর।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক উন্নত দেশ আইন বানায় বাচ্চা বেশী নেয়া যাবে বা। ফলে অনেকে রাষ্ট্রের কারণে বাচ্চা নষ্ট করে বা হত্যা করে। কিন্তু আজ ৩০ বছর অতিবাহিত হবার পর তারা সম্মতি ফিরে পাচ্ছে। বলছে- বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। কর্মীর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এজন্য অন্য দেশ থেকে শ্রমিক আনতে হবে। নতুবা জন্মের হার বাড়াতে হবে। হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌র আইনে হস্তক্ষেপ করলে এমনই হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, সব বাচ্চার সাথে সম ব্যবহার না করা ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। মু'মিনদের মাঝে সর্বোত্তম মু'মিন সে যে আমলে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মাঝে সে সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, রসূল (সা.) বলেছেন তোমাদের মাঝে সে সর্বোত্তম যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। অন্যের সাথে সে ভালো ব্যবহার করতে পারে যে নিজ পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, মহিলার অতি অশ্লীলতা ব্যতীত সব ছোট ছোট আচরণ সহ্য করা উচিত।

হুযূর (আই.) এতিমদের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন,

এতীমদের বিষয়ে এত জোর দেয়া হয়েছে আমার মনে হয়েছে তাদেরকে না আবার ওয়ারীশ বানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক গরীবও এতিম হয়, আবার অনেক ধনীও এতিম হয়। তাদের সম্পদ যেন অন্যরা অন্যায়ভাবে গ্রাস না করে এ শিক্ষা ইসলামে দেয়া হয়েছে।

এরপর হুযূর (আই.) পর্যায়ক্রমে– ব্যবসা বাণিজ্যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা এবং কোন ধরনের প্রতারণা না করা; ন্যায় ও নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সৃষ্টির অধিকার প্রদান করার প্রতি মনোযোগী হওয়া;

সর্ববস্থায় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির পথ পরিহার করা; ইত্যাদি বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোকপাত করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য উভয় পক্ষকে সহনশীল হতে হবে। রক্ত ঝরানোর পথ পরিহার করতে হবে। শান্তির জন্য এগিয়ে আসতে হবে। .....পরাশক্তিগুলো যদি ন্যায়ের ব্যাপারে বাধ্য করে তাহলে এ অবস্থা দূর হতে পারে।

হুযূর (আই.) বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব কয়েক কোটি ডলারের অস্ত্র সৌদি আরবের কাছে বিক্রি করেছে। এ টাকা সৌদি যদি ইয়েমেনের সাহায্যের জন্য উন্নতির জন্য খরচ করতো তাহলে এ যুদ্ধই হতো না।

হুযূর (আই.) বলেন, এ বছর জলসায় উপস্থিত ছিল ৩৮ হাজার ৩শ জন। প্রথম দিন থেকেই তারা জলসায় এসেছে।

মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন

নবীনদের পাতা-

আত্মত্যাগের মহিমায় ঈদুল আযহিয়া

মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ
নওবেকী, সাতক্ষীরা

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রকে মক্কার ধুধু মরু প্রান্তরে, (জনমানবহীন) তার মা হাজেরাকে সহ রেখে এসেছিলেন। তাদের সাথে ছিল সামান্য (খাদ্য ও পানীয়)। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই যে কাজ তা কে সহ্য করতে পারে? যেখানে রাতের অন্ধকারময় ঠান্ডা মরুভূমি, দিনের প্রচন্ড রৌদ্র তাপ দগ্ধ সূর্যের আলো। মাত্র দু'এক দিনের খাবার হাজেরাকে দিয়ে যখন তিনি ফেরত যাচ্ছিলেন তখন বিবি হাজেরা তাঁকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করেন– হে ইবরাহীম আপনি কেন এখানে শিশুপুত্রসহ আমাকে রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন তাদের দিকে না ফিরে উপরের দিকে আঙুল ইশারা করে বললেন, 'আল্লাহ্‌র আদেশ'। হযরত হাজেরা তার স্বামীকে বিশ্বাস করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কথায় প্রশ্ন করতেন না। মেনে নিতেন। বিবি হাজেরা জানতেন তার স্বামী আল্লাহ্‌র নবী। প্রিয় বান্দা। তাই যখন ইবরাহীম (আ.) ওপরের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলেন তখন বিবি হাজেরা তা মেনে নিলেন। বর্তমানে হজ্জের যে অনুষ্ঠান মক্কাতে হয় তার সূত্রপাত এখান থেকেই। এই যে আত্মত্যাগ– একে তো তাঁর একমাত্র শিশুপুত্র আর তাঁর স্ত্রী হাজেরাকে এরূপ এক স্থানে রেখে যাচ্ছেন যেখানে তাদের সাহায্য করার মত কেউ নেই। এই যে মহান কুরবানী বা আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে তা ছিল নজীরবিহীন। পরের ঘটনা তো সকলেই জানেন। পিতা বলছেন, "হে আমার পুত্র আমি স্বপ্নে দেখছি আমি তোমাকে জবাই করছি। তোমার কি মত? পুত্র বলছেন, "হে পিতা আপনার ওপর যে আদেশ হয়েছে তা আপনি পালন করুন। আমাকে আপনি ধৈর্যশীল পাবেন।" পিতা-পুত্র উভয়ে রাজী হয়ে গেলেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের কুরবানী করার জন্য জবাই দিতে জবাই হতে। যখন গলায় ছুরি দিতে উদ্যত– আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ.)কে ডাক দিলেন, "হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্ন সফল করেছ।" এই কুরবানী আল্লাহ্ গ্রহণ করলেন। মানুষের পরিবর্তে পশু কুরবানী দিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘটনা।

পৃথিবী থেকে নরবলি প্রথা এর মাধ্যমে চিরতরে বিলুপ্ত হল। আর এই ঘটনা মানবজাতির জন্য চিরকাল সংরক্ষিত হল। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইলের এই কুরবানী স্মরণের জন্য নিজেদের আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমন ভাবে পেশ করার জন্য আজ আমরা কুরবানীর ঈদ উদযাপন করছি। এই যে ঈদুল আযহিয়া বা কুরবানীর ঈদ আমরা উদযাপন করছি একে এজন্য কুরবানীর ঈদ বলা হয় তাহল "কুরব" শব্দ থেকে কুরবানী– অর্থাৎ কুরব মানে নৈকট্য। খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন। খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রতিটি ত্যাগই কুরবানী। আল্লাহ্‌র জন্য গরু, ছাগল, ভেড়া উৎসর্গ করেন আর অর্থ বা টাকা পয়সা ব্যয় করেন- সবই কুরবানী। কুরবানীর অর্থ গলায় ছুরি চালানো নয়। এর অর্থ ত্যাগ স্বীকার। আজকে মহান এক ঈদ আমরা পালন করছি যার যার সাধ্যমত পশু জবাই করছি যেখানে আল্লাহ্ বলেন, "কুরবানীর যে পশু এর রক্ত মাংস আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না। আল্লাহ্ দেখেন তাক্‌ওয়া বা খোদাভীতি।" তাক্‌ওয়ার ময়দানে কে কত অগ্রসর। লোক দেখানো বড় বড় পশু কুরবানী করে, ভূরি ভোজ, নতুন জামা কাপড় পরে আনন্দ উৎসব করা ঈদ নয়। আমরা যে ঈদ পালন করব তা হবে আল্লাহ্‌র জন্য আমাদের সাধ্যমত সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার। পশু কুরবানীর মাধ্যমে নিজের নফসকে কুরবানী করা নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা।

জীবনে ঈদকে স্থায়ীরূপে পেতে হলে দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সাধ্যমত সবকিছুকে আল্লাহ্‌র জন্য বিলিয়ে দেওয়ার যে আনন্দ সেটাই জীবনের প্রকৃত ঈদ। আমরা কে কতটুকু আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর তা আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অন্তর দিয়ে বুঝি। আমাদের হৃদয়ের গভীরে আল্লাহ্‌র দৃষ্টি আছে। আমরা যা-ই করি না কেন আল্লাহ্‌র আয়ত্তের বাইরে কেউ কখনও যেতে পারব না। মৃত্যু নামক শরবতের পেয়ালা আমাদের সবাইকে পান করতে হবে। আজ অথবা কাল, মৃত্যু আমাদের হবেই। আমরা আল্লাহ্ থেকে কেউ কিছুই লুকাতে পারব না। ঈদ যখন আসে আমরা সেমাই, পোলাও, মাংস খাব। ভোজবাজী উৎসব করব এর মধ্যে যদি যে কারণে ঈদ সেই কুরবানীর রূহ না থাকে তবে তাতে কোন লাভ হবে না। আমরা যদি আল্লাহতে ভয় করার ইচ্ছা করি তবে সেভাবেই করতে হবে। তা না হলে লাভ হবে না। এর সাথে বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র তসবিহ্ (মহিমা ও পবিত্রতা) ঘোষণা করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মহান ত্যাগের অনুসরণে আমাদের নবী করীম (সা.) এর জীবনে ঈদ এসেছিল। তিনি গণমানুষের জন্য সব বিলিয়ে দিতেন। নিজে অনাহার থাকতেন। হযরত (সা.)-এর সাহাবাদের জীবনেও ঈদ এসেছিল। সে ঈদ কিরূপ ছিল? সাহাবীর (রা.) কিরূপ কুরবানী করেছিলেন? তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। ভেদাভেদ ছিল না। মানুষ ছিল একে অপরের জন্য দরদেদীল। নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনের, অন্যের সুখ-দুঃখ হাসি আনন্দের প্রাধান্য দিতেন। আর আজ? অন্যের দুঃখে আমরা খুশী হই। অন্যের হক মেরে নিজেরা পুষ্ট হই, এতেই আনন্দ পাই। অন্যের ভাল দেখলে আমরা ঈর্ষান্বিত হই। এই কি আমাদের ঈদ? সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে। এই হবে আমাদের কুরবানীর রূহ্। এই হবে আমাদের কুরবানীর ঈদ। ঈদুল আযহিয়া– বড় ঈদ। ঈদকে সামনে রেখে আমাদের প্রথম চিন্তা করতে হবে সেই সব ভাইদের কথা যাদের জীবনে আজ ঈদ নেই। নতুন জামা কাপড় নেই। ঘরে খাবার নেই। হাতে কাজ নেই। ব্যবসায় পূঁজি নেই। রোগের চিকিৎসা নেই। বসত ঘরের চাল ডাল নেই। সেই সব দুর্বল অসহায়দের নিয়ে আমরা যদি আজ ঈদ উদযাপন করতে পারতাম তবে পরিবারে পরিবারে ঈদের তারতম্য হত না। সমাজে জাতিতে দেশে আজ প্রকৃত ঈদ উৎসব হত। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জাতির জন্য খাঞ্চা ভরা খাদ্য পাওয়ার প্রার্থনা করেন যে তাঁর

জাতির প্রথম প্রজন্ম এবং শেষ প্রজন্মের জন্য তা ঈদের কারণ হয়। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হযরত ঈসা (আ.) এর শক্তি ও গুণে গুণান্বিত হয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতের শেষ যুগে নাযিল হয়েছেন। তিনি তাঁর জাতি অর্থাৎ আহমদীদের জন্য এই প্রার্থনা করেছেন।

সুতরাং এখন পৃথিবীর তকদীর বদলানো হবে। তা এ কারণে যে আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ.) এর প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলেন, যদি এই খাদ্য সম্ভার পেয়ে তাঁর জাতি অকৃতজ্ঞতা করে তবে তাদেরকে মহা আযাবে গ্রেফতার করে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ যুগের ঈসা– অর্থাৎ মুহাম্মদী ঈসা (আ.) ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন এই খাদ্য সম্ভার যা আল্লাহ্ পাঠাবেন তা হবে পৃথিবীবাসীর সকলের জন্য সম বন্টনের ভিত্তিতে সবার জন্য ঈদের কারণ। ঈসা (আ.) এসেছিলেন একটি জাতির জন্য কিন্তু মুহাম্মদী ঈসা (আ.) এসেছেন সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য। খ্রিষ্টান জাতি খোদাকে তিন ভাগ করে মহা যুলুম করেছে। অকৃতজ্ঞতা করেছে তাই তাদের এ নেয়ামত এখন মুহাম্মদী ঈসার (আ.)-এর জাতি অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীবাসীর আহমদী ভাইদের জন্য হবে প্রকৃত ঈদ।

আজকে আমাদের একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা যখন ঈদ উৎসব করি তখন অন্য কোন জাতিকে সঙ্গে নিতে পারি না। দাওয়াত দিতে পারি না। কেন? তা এজন্য যে, অন্যান্য জাতি আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা করে তাদের উৎসব আমাদের ধর্মের বিপরীত। আমরা করি স্রষ্টার ইবাদত তারা করে সৃষ্টির ইবাদত। অন্য জাতি আমাদের উৎসবের স্থলে আসতে পারে না বা আসে না। কিন্তু এখনকার যুগে মুসলমানরা অন্যজাতির উৎসবে যোগ দিয়ে উৎসবের আমেজ বাড়িয়ে দেয়। মুসলমান যুবকরা এতে বেশী উৎসাহ বোধ করে। কেন? এজন্য যে, সেখানে নারী-পুরুষ পাশাপাশি যোগ দেয়। পূজা মন্ডপে বাহারী সাজ। মাইকে গান-বাজনা। নারীদেরও কোন পর্দা থাকে না অবাধ দর্শন। মুসলমান যুবকরা এতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের উৎসবে নারীদের অবাধ দর্শনের কোন সুযোগ নেই, বাদ্য-বাজনা নেই। পূজা মন্ডপের সাজ গোজের মত দেখার কিছু থাকে না। স্রষ্টার ইবাদতের সাথে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের একটা বিষয় চিন্তা করতে হবে। আন্তধর্মীয় এই যে পার্থক্য এটা কি স্রষ্টা চান? স্রষ্টা কি বিপন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন? মুসলমানদের এটা ভেবে দেখতে হবে। কেননা মুসলমানদের আল্লাহ্ দায়িত্ব দিয়েছেন সব জাতির লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতে– তবলীগ করতে। সেই যে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত স্রষ্টা একটাই ধর্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন এলাকায় যেমন ভারতবর্ষ, চীন, ইরান, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থানে নবী বা অবতারদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন সেটাই সনাতন ধর্ম আল ইসলাম। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে মানুষ জাতিগত, গোষ্ঠিগত, ব্যবসাগত স্বার্থে ধর্মে ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করে আসল শিক্ষাকে বিকৃত করে পৃথিবীকে কলুষিত করেছে। ধর্ম নষ্ট করেছে। ধর্মে এমনভাবে প্রক্ষেপন করেছে তাতে মনে হয় যেন এক এক জাতির ধর্ম পৃথক। কিন্তু না, আদিকাল থেকে পৃথিবীতে একটাই ধর্ম একই স্রষ্টা। পূর্ববর্তী ধর্মে ছিল ইসলাম ধর্মের আংশিক শিক্ষা। বর্তমানে এই শেষ যুগে পৃথিবী যখন একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে বিশ্বের কোথাও আর দৃষ্টির বাইরে নেই তখনই হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে একমাত্র ধর্মীয় নেতা হিসাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলাম অর্থাৎ সনাতন ধর্মের পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে তিনি এসেছেন বিশ্বাবাসীর মুক্তির জন্য। কিন্তু আমরা মুসলমানরা আল কুরআনের শিক্ষা নিয়ে অন্যজাতির কাছে যেতে পারি না। এটা মুসলমানদের দুর্বলতা। কেননা মুসলমানরা জাতিগত ও গোষ্ঠীস্বার্থে নিজেরা ফেরকায় বিভক্ত। এখন ঘর সামলাবে না পর সামলাবে। তবে আশার বাণী হল- আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বীকে এক ধর্মে একত্র করবেন এবং সেজন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে বিশ্বনবী হিসাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীতে আর কোন বিশ্বনবীর আবির্ভাব হবে না। অন্য কোন জাতিতে এখন নবী আগমনের পথ রুদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যত নবী বা অবতার এসেছেন তারা একই শিক্ষা প্রচলন করেছিলেন। মানুষে মানুষে সাদাকালো বিভিন্ন রঙের পার্থক্য থাকলেও ধর্মীয় শিক্ষায় কোন পার্থক্য ছিল না। সকল নবী বা অবতারগণের শিক্ষা ছিল পরমেশ্বর আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। নিরাকার যেমন বাতাস আলো নিরাকার অস্তিত্ব। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই ডাকতে হবে। তাকেই সিজদা করতে হবে। সকল জাতির ধর্মগ্রন্থ প্রক্ষেপন হয়ে বিকৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিরাকার স্রষ্টার উপাসনা করতে হবে এটা সেসব ধর্মগ্রন্থ থেকে কেউ মুছতে পারে নাই। তবে সে সব জাতি তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের বাপ-দাদাদের আচরণ বিধির অনুসারী হয়ে সৃষ্টিপূজায় লিপ্ত রয়েছে। আর মুসলমান জাতিও প্রচার বিমুখ। তাদের এক নেতা নেই। মজবুত সংগঠন নেই। মুসলমানরা অন্য জাতির নিকট প্রচার করার কোন অভিজ্ঞতা রাখে না। এখন মুসলমানরা নিজেদের নিয়ে আছে ঘর সামলাবে না পর সামলাবে। ভিন্ন জাতিকে তবলীগ করবে না নিজের সংসার নির্বাহ করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদের ঘরে খাবার না থাকলেও তারা প্রচার বিমুখ হয় নাই। কারণ তাদের জীবনে ঈদ ছিল। কুরবানীর রূহ্ অন্তরকে আলোকিত করে রেখেছিল। এই শেষ যুগে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লার। তিনি তাঁর বান্দাগণকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনার জন্য। তাই বান্দা পথভ্রষ্ট হবে আর আল্লাহ্ নির্বিকারে থাকবেন তা কি করে হয়?

আল্লাহর এক নাম হাদী। অর্থাৎ হেদায়াত দাতা পথ-প্রদর্শক, তাই তিনি রহমান গুণে মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য শেষ যুগের কলকি অবতার কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। কলকি অবতার এসে বিভিন্ন জাতিকে ডাক দিয়েছেন। কুরআন করীমের আলোকে যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে সত্য শিক্ষা লাভ করে– সত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নিভৃত গ্রাম কাদিয়ান থেকে আজ হতে ১২৬ বছর আগে আল্লাহ্ তাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, "ম্যায় তেরি তবলীগ কো দুনিয়াকে কিনারোঁ তাক পহঁচাউঙ্গা"। আর সেই বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। আজ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়ার ২০৯ টি দেশে (২০১৬) ৩০ কোটির কাছাকাছি লোক আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত করে প্রবেশ করেছেন। এ ধারা অব্যাহত আছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক এ জামাতে দাখিল হচ্ছেন। এ বছরও ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৮৩ জন ব্যক্তি নতুন বয়আত করেছেন।

আমরা এক নেতার অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ঈদ উদযাপন করি। জাতিতে জাতিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদ উদযাপন। আমাদের প্রচারকগণ সব জাতিতে কাজ করেছেন। আশা করি ইনশাল্লাহ্ সহসা আমাদের বিজয় হবে। বিশ্ব বিজয়। তখনই আমাদের ঈদ পূর্ণতা লাভ করবে। সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত ঈদ। আল্লাহু আকবার।

প্রকৃত অর্থে কুরবানীর গুরুত্ব

লাকী আহমদ
তেবাড়িয়া, নাটোর

ঈদুল আযহিয়া হলো বড় ঈদ। ঈদুল আযহিয়া নাম রাখার কারণ হলো এটি কুরবানীর ঈদ। এই ঈদ যিল হাজ্জ মাসের ১০ তারিখ হজ্জের ইবাদতের শেষে উপস্থিত হয়। (হজ্জ ৯ তারিখে হয়)। হযরত রসূল করীম (সা.) এই ঈদকে ঈদুল আযহিয়া বলেই উল্লেখ করেছেন। আযহা আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো কুরবানীর জন্তু। ইসলামী পরিভাষায় এর অপর নাম হলো 'ইয়াউমুন নহর'। অর্থাৎ কুরবানীর জন্তু। উভয় নামই স্বয়ং মহানবী (সা.) ব্যবহার করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) খোদা তা'লার আদেশে তার প্রথম পুত্র ঈসমাইলকে জন ও বৃক্ষলতাশূন্য মক্কা উপত্যকায় এনে বসবাস করতে রেখে যান। সেখানে জীবন ধারণের কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইবরাহীম (আ.) এর ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল। স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন যে, তিনি তার পুত্রকে যবাহ করছেন। তখন খোদা তা'লা পুত্র কুরবানীর স্থানে বাহ্যিকভাবে পশু কুরবানীর আদেশ করেন। হজ্জে কুরবানীর প্রথা ঈসমাইল (আ.) এর এই কুরবানীর একটা বাহ্যিক আলামত। যার মাধ্যমে এই অতুলনীয় কুরবানীর স্মৃতি চিরদিন জাগরুক থাকে।

ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করার গুরুত্ব বা ফযিলত ব্যাপক। যদিও সামর্থহীন অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী ওয়াজীব নয়। কিন্তু যারা সামর্থ্যবান তাদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। হযরত রসূল করীম (সা.) ঈদুল আযহা উপলক্ষে নিজেও কুরবানী করতেন এবং তার সাহাবীদেরকেও কুরবানী করার জন্য নির্দেশ দিতেন। এই ব্যাপারে হাদীসে অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) হিজরতের পর মদীনায় দশ বৎসর অবস্থান করেন এবং তিনি প্রতি বছরই 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে মদীনায় কুরবানী করতেন। (তিরমিযী)। শুধু তাই নয়। ঈদুল আযহার কুরবানীর প্রতি তাঁর (সা.) এত অধিক খেয়াল ছিল যে তিনি (সা.) ওফাতের পূর্বে তার জামা'তা ও পিতৃবৎ পুত্র হযরত আলী (রা.)কে ওসীয়্যত করেন, তাঁর পরেও (ওফাতের পর) যেন তাঁর পক্ষে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে সর্বদা কুরবানী করা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত হাবসা (রা.) বলেন, তিনি হযরত আলীকে দেখলেন, ঈদুল আযহার দুটি দুম্বা কুরবানী করছেন। তিনি হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, দুম্বা কুরবানী করার কারণ কি? হযরত আলী (রা.) বললেন যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওসীয়্যত করেছেন যেন তিনি তাঁর পক্ষে তাঁর ওফাতের পরেও কুরবানী করতে থাকেন। এইজন্য তিনি হযরত রসূলে করীম (সা.) এর পক্ষে কুরবানী করেন। (আবুদাউদ)

এতে বুঝা যায় রসূল করীম (সা.) নিজে কুরবানী করতেন এবং সাহাবাদেরকেও কুরবানী করার তাহরীক করতেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, হযরত বারা (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিন প্রথমে খুতবা দেন এবং বলেন এই দিনে মানুষ প্রথমে ঈদের নামায পড়বে এবং পরে কুরবানী করবে। তিনি (সা.) আরেক স্থানে বলেন যাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না তারা কেন ঈদ গাহে এসে নামাযে শামিল হয়।

ব্যক্তিগত শখ অথবা বন্ধু-বান্ধব এবং কিছু দরিদ্রকে গোশ্‌ত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যেই রসূল (সা.) একাজ করতেন না, বরং তিনি একে একটি ধর্মীয় কাজ জ্ঞান করতেন, পুণ্যকাজ মনে করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যায়েদ বিন আকরাম (রা.) মহানবী (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ্! ঈদুল আযহার এই যে কুরবানী, এটি কেন করা হয়? হযরত রসূলে করীম (সা.) বললেন, এটি তোমাদের প্রধান পূর্বপুরুষ ইব্রাহীমের প্রবর্তিত রীতি (সুন্নত)। তিনি বললেন, তবে আমাদের জন্য এতে লাভ কি? তিনি বললেন, কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেকটি লোম কুরবানী কারীর জন্য এক একটি পুণ্য, যা তাকে খোদার কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য করবে। (ইবনে মাজা)।

হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, মহানবী (সা.) ঈদের কুরবানী সম্বন্ধে বলতেন, খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ঈদুল আযহার দিন মানুষের অন্য কোন কর্ম কুরবানীর জন্তু জবেহ করা অপেক্ষা প্রিয়তর নয়। (তিরমিযী) ঈদুল আযহিয়ার নামায আদায় শেষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রীতি মোতাবেক পশু জবাই করে শরীয়তের বিধান মতে এর গোশত বন্টন করাই হলো ইবাদত। হযরত রসূল করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবনে এরকম ঈদই পালিত হয়েছে। অতএব সেরূপ ঈদ পালনই মানুষের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা ও তাকওয়া হাসিলের কারণ হয়। যার ফলে পরস্পরের মাঝে ঈমানী-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর হয়ে স্বর্গীয় এক পরিবেশে চরম ও পরম আনন্দ অনুভব হয়। আর এর নামই প্রকৃত ঈদ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে না তাদের জন্য এটা ঈদ নয়। তাদের জন্য এ কেবলই আমোদ-প্রমোদের মেলা বৈ কিছুই নয়।

আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত কুরবানীর পশু যেন নিখুঁত হয়। কুরবানীর আদেশ রয়েছে বলে যে কোন ধরনের পশু কুরবানী করলেই চলবে না। এই ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে ঈদুল আযহা থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের এবং কুরবানীর গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন। (আমীন)।

ইসলামে কুরবানীর শিক্ষা

আনোয়ারা বেগম
রংপুর

"কুরবানী" শব্দের অর্থ হলো আত্মত্যাগ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন বা নৈকট্য লাভের বাহন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী করো।" (সূরা আল কাওছার) কুরবানী মানে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে মু'মিন বান্দা স্বীয় আত্মাকে আল্লাহ্ মুখী করার সুযোগ অর্জন করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুটি বড় উৎসবের একটি হলো "ঈদুল আযাহিয়া" যা মূলত: কুরবানীর ঈদ। যা জিলহজ্জ মাসেই উদযাপিত করা হয়। কুরবানী প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে, "সব সম্প্রদায়ের জন্য আমি কুরবানীর বিধান বা নিয়ম দিয়েছি, আমি তাদের জীবনোপকরণের জন্য যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর ওপর যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে" (সূরা হজ্জ)। হজ্জ কুরবানীর সংকেত প্রকাশ করে। এটি একটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান। ইবনে মাজা হাদীসে বর্ণিত আছে–"যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানী করে না সেই যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছেও আসে না।"

এই জগতে দেখা যায় প্রত্যেক নিম্নতর প্রাণী তার চেয়ে উচ্চতর প্রাণীর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করছে! বান্দার উচিত তারা যেন তার চেয়ে উচ্চতর সত্তা, তার প্রভু, তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে তার জীবনকেও কুরবানী করে। পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার তিনি মু'মিনদেরকে কুরবানীর নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই নির্দেশসমূহ সূরা আল্ কাওসারের নির্দেশেরই প্রতিধ্বনি! এর শিক্ষা হলো, ত্যাগ ও মহান আল্লাহ্‌র নিকটে আত্ম নিবেদন! চার হাজার বছর পূর্বে মানবজাতির আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে তিনি কতিপয় আদেশাবলী দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেই আদেশগুলি তিনি (আ.) পূর্ণ করেছিলেন।

ধর্মের জন্য তেরশ বছর পূর্বে মানুষ সর্বশক্তিমানের পথে নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিতো আর সেটাই ছিল প্রকৃত বড় ঈদ এবং ঐ সময়টাই ছিল প্রকৃত সময় যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহগণ পবিত্র হজ্জ ও ঈদুল আয্‌হিয়ার দিন যে কুরবানী করে থাকে– তা কেবল নিছক আনন্দ ফুর্তিই নয়– তা ইব্রাহিম (আ.)-এর কুরবানীর একটি "প্রতীক-দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কুরবানীর মূল উদ্দেশ্যই হলো "তাক্ওয়া" যার প্রভাবে মু'মিন বান্দা নিজেকে পশুর ন্যায় কুরবান করতেও দ্বিধা করে না। ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্ পাক ইবরাহীম (আ.)কে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। "বলুন নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মত্যু সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য!" আয়াতাংশটি থেকে এটা স্পষ্ট যে কুরবানী আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হতে হবে। লৌকিকতা ও সামাজিকতার জন্য নয়। এটি ইসলামের ঐতিহ্য। তাক্ওয়াশীল বান্দার কুরবানীই কবুল হবে।

"কারো আপন জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম"–এই নীতিতে আহমদীগণ অটল! আহমদী সমগ্র জীবনই কুরবানী করতে প্রস্তুত! কুরবানী ঈমানরূপ বৃক্ষকে সদা সজীবও রাখে ও প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী করে। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সময়ে হযরত আবুবকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) ইসলামের সেবায় তাঁদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন কুরবানীকে পুনরায় "মর্যাদায়" উন্নীত করেছে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত সকল ধর্মেই কুরবানীর নির্দেশ রয়েছে, তবে ইসলাম ধর্ম কুরবানীর শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করেছে। প্রয়োজনের সময়ে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীকারীদের মর্যাদা অন্য সময়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ। আল্লাহ্‌র প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করুক এবং কুরবানীর মূল শিক্ষাকে আমলে বাস্তবায়িত করুক, আমীন।

বিশেষ ঘোষণা

সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইশায়াত (প্রকাশনা) বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত **বাংলা নযমের বই** প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনারা জানেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেবের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে বাংলাদেশে আরো অনেক প্রতিভাবান নযমের লেখক তৈরী হচ্ছে এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

তাই আপনাদের মধ্যে যারা বাংলা নযম লিখেন তারা অতি সত্তর আমাদের কাছে সেগুলোর একটি কপি পাঠিয়ে দিন। আমরা সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করে ইনশাআল্লাহ্ উক্ত বইয়ে ছাপাবো। উল্লেখ্য, এই বইয়ের সাথে আমরা নযমগুলির একটি অডিও সি.ডি দেয়ার চেষ্টা করবো যাতে আপনারা অতি সহজে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারেন। একারণে নিজেদের নযমের জন্য যদি আপনাদের কাছে কোন সুর নির্দিষ্ট থাকে তাহলেও আমাদের জানাবেন।

আমাদের কাছে নযম পাঠাবার ঠিকানা:

প্রাপক
মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
৪ নং, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।
প্রয়োজনে: ০১৭২৬-৫৪৯৫৪৮ এবং
০১৯১২-৮৩৫৯৮১ (জি.এম. সিরাজুল ইসলাম)

সং বা দ

ভাতগাঁও জামা'তের রামপুর হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

ভাতগাঁও জামা'তের (রামপুর হালকায়) গত ২২/০৭/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ভাতগাঁও জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন সালমান আহমদ এবং নযম পাঠ করেন সোহেল আহমদ। এতে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন মৌ. নুরুল ইসলাম, জনাব মাসুম আহমদ বিপ্লব, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এবং জনাব আবু সালেহ্ আহমদ। বাংলা নযম পরিবেশ করেন সামিউল ইসলাম। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ

ডোহান্ডা জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/ ০৭/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ডোহান্ডার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাব্বির আহমদ। নযম পাঠ করেন সালেহ আহমদ সুমন। জলসায় মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ তুলে ধরে বক্তৃতা করেন মৌ. শামীম আহমদ এবং মওলানা শেখ শরীফ আহমদ। উপস্থিত সকলে হুযূর (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি দেখেন। তারপর তবলীগি প্রশ্ন উত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামীম আহমদ

বৃহত্তর সিলেট জেলার–জেলা তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

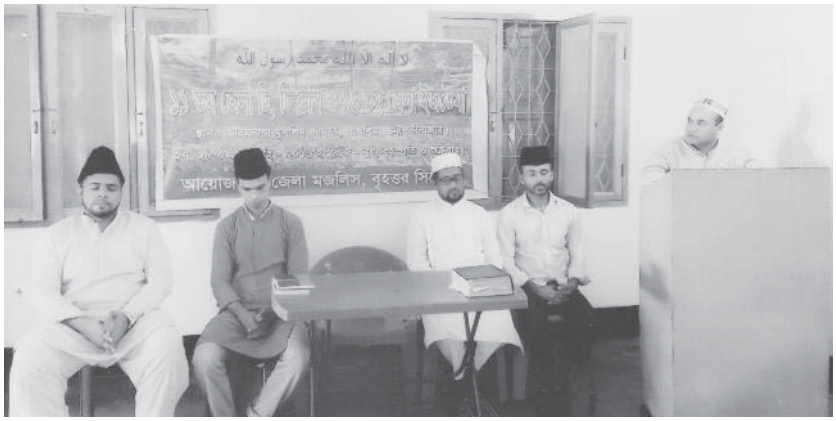

গত ২৭, ২৮ ও ২৯ জুলাই ২০১৬ রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃহত্তর সিলেট জেলার ১১তম জেলা তালীম-তরবিয়তী ক্লাস ও ১৬তম জেলা ইজতেমা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পাগুলিয়াতে অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। ২৭ জুলাই সকাল ৯:৩০ মিনিটে জনাব রফিক আহমদ আলমগীর জেলা কায়েদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে তালিম তরবিয়তী ক্লাস ইজতেমার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ২৮ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাস চলে। তালিম তরবিয়তী ক্লাসে শিক্ষা প্রদান করেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মওলানা সৈয়দ মুজাফফর আহমদ, মৌ. হুমায়ুন কবীর, জনাব মুহাম্মদ শরীফ হোসেন, জনাব মুহাম্মদ ওসমান গনী ও জনাব সফিক আহমদ চৌধুরী। বৃহত্তর সিলেট জেলার ৮টি মজলিস এর মধ্যে ৬টি মজলিস হতে খোদ্দাম ও আতফালগণ উপস্থিত হোন। ২৯ জুলাই শুক্রবার বাদ জুমুআ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব সোহেল আহমদ, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস, এম, আরমান। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফাহিম ইকবাল এবং নযম পাঠ করেন রাফি আহমদ চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ক্লাস ও ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। এতে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

রফিক আহমদ আলমগীর

তেজগাঁও জামা'তে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯ আগষ্ট বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক রচিত 'আল ওসীয়্যত' প্রস্তকের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয় স্থানীয় মজলিসের যয়ীম জনাব মাকসুদ উল হক-এর সভাপতিত্বে। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। উক্ত পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন স্থানীয় জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ বোরহানুল হক। শেষে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম-এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাকসুদ উল হক

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ফতুল্লা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন

গত ৩ আগষ্ট-২০১৬ বুধবার সংগঠনের ব্যানারে মজলিস আনসারুল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রবীণ ঢাকার উদ্যোগে ফতুল্লা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়।

শত বছরের অধিক পুরাতন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি ৩৩ বছর যাবত এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। উক্ত বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে যোগ দেন মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার যয়ীম আলা জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ সহ ৫ জনের টিম। পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ের মাঠের চতুর্দিকে প্রায় ৫০ টি উন্নত মানের বিভিন্ন জাতের চারাগাছ লাগানো হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের চা-নাস্তার ব্যবস্থা করেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে কর্মশালা ও রিভিউ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুলাই-২০১৬ শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে দিনব্যাপী আনসারুল্লাহ্ ঢাকা অফিসে ষান্মাসিক কর্মশালা ও রিভিউ মিটিং এর আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে মোন্তাযেমগণ নিজ নিজ দপ্তরের ষান্মাসিক রিপোর্ট এবং আগামী ৬ মাসের কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা ও জনাব তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। আমীর সাহেব নসিহতমূলক ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। তিনি ঢাকার ষান্মাসিক রিপোর্ট দেখেন এবং কিভাবে সাংগঠনিক কাজ করা উচিত তা আলোচনা করেন। তিনি খলীফাতুল মসীহ্ ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি ৩৮তম শূরার ১, ২ ও ৩ নম্বর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও বাৎসরিক কর্ম-ক্যালেন্ডার অনুসারে কাজ করার নির্দেশ দেন।

এরপর শ্রেষ্ঠ মোন্তাযেম ও যয়ীমগণদের পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়ীয়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৮/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়ীয়া, নাটোর-এর বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাকিলা আনোয়ার। যৌথভাবে নযম পাঠ করেন তিশা, তিথী ও রুচী। তারপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবেদ আলী মোল্লা। এরপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মুরব্বী মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট লাকী আহমদ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তা বশীর। এরপর লাজনা ও নাসেরাতদের কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কাসীদা, হাদীস ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন স্বপ্না মুসতারী। নযম পাঠ করেন সুরাইয়া শারমীন। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট লাকী আহমদ, নাসেরাত সেক্রেটারী তিশা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তা বশীর। শেষে পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। এতে ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

বিনীত দোয়ার আবেদন

আমাদের একমাত্র কন্যা **'আফিয়া আহমদ সপ্তর্ষী'** বয়স ৫ বছর (ওয়াকফে নও, ১৭৭৪৪-বি), সে আড়াই বছর বয়সে পায়ে ব্যাথা পেয়ে বিভিন্ন অর্থোপেডিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রয়েছে। আমাদের দেশের অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন ইন্ডিয়ার ভেলোরের 'সিএমসি' হাসপাতালে অপারেশন করানোর। তাই সে উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.)-এর সদয় অনুমতিক্রমে চলতি মাসের ৩০ তারিখে (আগষ্ট ২০১৬) ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব, ইনশাআল্লাহ। আফিয়ার পূর্ণ সুস্থ্যতা এবং দীর্ঘায়ুর জন্য সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের একমাত্র কন্যাকে সেই সাথে সকল শিশুকে সুস্থ্য এবং নিরাপদ জীবন দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী
মাহমুদ আহমদ সুমন
বাংলাডেস্ক, ঢাকা

৩১ অক্টোবরের মধ্যে তাহরীকে জাদীদের ২০১৫-১৬ সনের চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনারা অবগত আছেন যে, এই বৎসরের প্রথমেই হুযূর (আই.) সকল আহমদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, জামা'তের কেউই যাতে এই তাহরীক-ই-জাদীদ চাঁদার বাইরে না থাকেন। মনে রাখবেন নবজাতক থেকে বৃদ্ধ কাউকেই এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত করবেন না। যে কোন পরিমাণই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। নওমোবাঈনদেরও একই ভাবে শরীক করবেন। মৃত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের নামে এই চাঁদা দিয়ে তাদেরকেও জীবিত রাখার নির্দেশনা রয়েছে।

আপনাদের সকলের নিকট আবেদন, অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখ এই তাহরীকে জাদীদের ২০১৫ ও ২০১৬ অর্থ বছর শেষ হতে চলেছে। আপনারা অতিসত্তর চাঁদা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং অক্টোবর মাসের প্রথম দশদিন চাঁদা আদায়ের জন্য আশরা পালন করুন। জামা'তের সাথে যোগাযোগ তেমন নেই তাদের নিকটও খলীফার এই পয়গাম পৌঁছান ও তাদেরকে এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করুন (চাঁদা যত টাকাই দিন না কেন)। এ ব্যাপারে জামাতের সকল অংঙ্গ সংগঠন ও মুরব্বী/মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

চাঁদা আদায় এর রিপোর্ট আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করুন, যাতে যথা সময়ে হুযূর (আই.) দপ্তরে সমস্ত রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়। আমাদের সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে স্বচেষ্ট হই ও হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হই।

শহীদুল ইসলাম
সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বি: দ্র: প্রয়োজনে ০১৭১৪০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬ যোগাযোগ করুন বা SMS করুন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৫-০৮-২০১৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট নুরুন্নাহার বেগম। উক্ত ইজতেমায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তবলীগ সেক্রেটারী সেহলী সুরাইয়া ও নায়েব সদর-৩ নুরুন্নাহার মাকসুদ। কুরআন তেলাওয়াত করেন লাইলাতুল নূর এবং নযম পরিবেশন করেন ফাহমিদা হোসেন জেনী ও ফারিয়া হোসেন আভা। বক্তৃতা রাখেন মোবাশ্বিরীনা রহমান।

ইজতেমার আগের দিন লাজনা ও নাসেরাতের কুরআন তেলাওয়াত, কাসিদা, নযম এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বাদ জুমুআ সমপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কুরআন পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ।

কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোবাশ্বিরীনা রহমান

দাঈ ইলাল্লাহ্ কোর্স সম্পন্ন

গত ১, ২ ও ৩ আগষ্ট ২০১৬ তারিখ রোজ সোম, মঙ্গল ও বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী এক দাঈ ইলল্লাহ্ কোর্স করা হয়। উক্ত ক্লাসে লাজনাসহ মোট ১০ জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্লাসে কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত পুস্তক পড়ানো ও শিখানো হয়।

মহিউদ্দিন আহমদ

চাকরি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বকশি বাজারস্থ আই.টি একাডেমীর আন্ডারে প্রাণ-আর.এফ. এল গ্রুপের সহযোগিতায় জামা'তের পক্ষ থেকে বেকারত্ব দূরীকরণের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।
চাকুরী করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষিত/ অর্ধশিক্ষিত/ অশিক্ষিত বেকার সদস্য/ সদস্যাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় C.V জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ:

তফছির আহমদ রনি
আই.টি ইনস্ট্রাকটর-আই.টি একাডেমী
কো-অরডিনেটর- আমজাদ ফাউন্ডেশন।
৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭৩৬ ১০০৪২৬, ০১৬৮৪০৭৮৩৮২।
ইমেইল:
ahmed.tafsir@yahoo.com.

ভুল সংশোধন

পাক্ষিক আহমদীর ১৫ আগষ্ট ২০১৬ সংখ্যার ৪২ পৃষ্ঠার শোক সংবাদে মরহুম আব্দুর রহিম সাহেব-এর বয়আতের সাল ১৯৫২ সাল পড়তে হবে একই সংখ্যার ৪৪ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ২০ লাইনে ১৯৭১ সালের পরিবর্তে ১৯১৭ সাল পড়তে হবে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪৫তম জাতীয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬

সিলেবাস

০১। সহীহ্ কুরআন তেলাওয়াত:

খোদ্দাম: যে কোন স্থান হতে একাধিক আয়াত দেখে তেলাওয়াত করতে হবে। **আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫**, যে কোন স্থান হতে একাধিক আয়াত দেখে তেলাওয়াত করতে হবে। **আতফাল (কমর) বয়স: ১০-১২**, যে কোন স্থান হতে একাধিক আয়াত দেখে তেলাওয়াত করতে হবে।

০২। মুখস্ত কুরআন তেলাওয়াত: খোদ্দাম: সূরা আল বাকারা: ১-১৭, আল বাকারা: ২৫৬-২৫৮, আল বাকারা: ২৮৫-২৮৭, আল ইমরান:২৬-২৮, আল ইমরান: ১৯১-১৯৫,আল আনআম: ৬৯-১০১, আল আনআম:১০২-১০৯, রাদ: ৯-১৪, নাহল: ৬৭-৭১,বনী ইস্রাইল: ৭৯-৮৫, কাহাফ: ১-১১, কাহাফ: ১০৩-১১১, আহযাব: ৭০-৭৪, হামিম সেজদা: ৩১-৩৩, হামিম সেজদা ৩৪-৩৬, আল হাশর: ১৯-২৫, সূরা সাফ সর্ম্পূণ, সুরা আল জুমআ সর্ম্পূণ, সূরা আল মুনাফিকুন সর্ম্পূণ, আল মূলক: ১-৫, আল বুরুজ, তারেক, আলা, গাশিয়া।

আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫, সূরা ত্বীন, কদর, আসর, হুমায়জাহ, কারিয়াহ, তাকাসুর, শামস। সূরা ফিল, কোরাঈশ, মাউন, কাফেরূন, নাসর ও লাহাব।

আতফাল (কমর) বয়স: ১০-১২, সূরা ত্বীন, কদর, আসর, হুমায়জাহ, কারিয়াহ, তাকাসুর, শামস। সূরা ফিল, কোরাঈশ, মাউন, কাফেরূন, নাসর ও লাহাব।

আতফাল (সিতারা) বয়স: ০৭-০৯

আলিফ লাম মিম পারা , আম পাড়া, সূরা ফাতেহা, কাউসার, ইখলাস, ফালাক ও নাস। সূরা ফিল, কোরাঈশ, মাউন, কাফেরূন, নাসর ও লাহাব।

০৩। আযান: আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫

সুললিত কণ্ঠে আযান (অর্থসহ মুখস্ত) এবং অর্থসহ আযানের দোয়া। **আতফাল (কমর) বয়স:** ১০-১২, সুললিত কণ্ঠে আযান (অর্থসহ মুখস্ত) এবং আযানের দোয়া। **আতফাল (সিতারা) বয়স:** ০৭-০৯, সুললিত কণ্ঠে আযান (সম্পূর্ণ মুখস্ত)।

০৪। নযম (উর্দু): খোদ্দাম: হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বা মুসলেহ মাওউদ (রা.) অথবা অথবা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর যে কোন উর্দু নযম।

আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫– ইসলাম আওর বানী ইসলাম (সা:) সে ইশ্‌ক, হযরত নবী করীম (সা.) এর প্রশংসায় আরবী কাসীদা, মুনাজাত আওর তবলীগে হাক্ক, আওলাদকে হাক্ক মেঁ দোয়া, নওনেহালানে জামাআত সে খেতাব, আয়ে গোলামে মসীহেযযমাঁ হাত উঠা, এ্যায় মেরে সাঁসোঁ ম্যাঁ বাসনেওয়ালো।

আতফাল (কমর) বয়স: ১০-১২– ইসলাম আওর বানী ইসলাম (সা.) সে ইশ্‌ক, হযরত নবী করীম (সা.) এর প্রশংসায় আরবী কাসীদা, মুনাজাত আওর তবলীগে হাক্ক, আওলাদকে হাক্ক মেঁ দোয়া, নওনেহালানে জামাআত সে খেতাব, আয়ে গোলামে মসীহেযযমাঁ হাত উঠা, এ্যায় মেরে সাঁসোঁ ম্যাঁ বাসনেওয়ালো।

আতফাল (সিতারা) বয়স: ০৭-০৯, যে কোন উর্দু নযম।

০৫। নযম (বাংলা): খোদ্দাম, ইসলামী ইবাদত ও নযমুল মাহদী হতে যে কোন বাংলা নযম।

আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫– ইসলাম, জিয়ন কাঠি. খেলাফতের ডাক, খাতামান নাবীঈন, নামায, নফসে লাওয়ামা, নফসে লাওয়ামা, নিবেদন, মুসলমান, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)।

আতফাল (কমর) বয়স: ১০-১২– ইসলাম, জিয়ন কাঠি. খেলাফতের ডাক, খাতামান নাবীঈন, নামায, নফসে লাওয়ামা, নিবেদন, মুসলমান, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)। **আতফাল (সিতারা) বয়স:** ০৭-০৯, যে কোন বাংলা নযম।

০৬। বক্তৃতা (বাংলা): খোদ্দাম: ওফাতে ঈসা (আ.), মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, খাতামান নবীইন (সা.), খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত, এতায়েতে নেযাম। **আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫–** ওফাতে ঈসা (আ.), মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, খাতামান নাবীইন (সা.), খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত, এতায়েতে নেযাম। **আতফাল (কমর) বয়স: ১০-১২**, ওফাতে ঈসা (আ.), মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, খাতামান নাবীইন (সা.), খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত, এতায়েতে নেযাম। **আতফাল (সিতারা) বয়স: ০৭-০৯**, ওফাতে ঈসা (আ.), মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, খাতামান নাবীঈন (সা.), খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত, এতায়েতে নেযাম

০৬। বক্তৃতা (উর্দূ ও ইংরেজী): সবারই বাংলা বক্তৃতার বিষয়ের অনুরূপ হবে।

০৭। দ্বীনি মালুমাত লিখিত পরীক্ষা (নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামুলক): [এক বা একাধিক পর্বে হতে পারে]। **খোদ্দাম:** তালিমী বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী (লেভেল ১, ২, ৩, ৪)। **সিলসিলার কিতাব:** ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের 'কাম সতীত্ব রক্ষা' অধ্যায়, যুগ খলিফার তাজা নির্দেশনা পুস্তক। সেই সাথে, উপরে উল্লেখিত লেভেলের সিলসিলার কিতাব ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। **দ্বীনিমালুমাত:** সপ্তম পরিচ্ছেদ (ইসলামের মৌলিক ধারণা ও প্রাথমিক কাল), অষ্টম পরিচ্ছেদ (ইসলামের পূনর্জাগরণ)।

আতফাল (বদর) বয়স: ১৩-১৫– তালিমী বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী (লেভেল ২ এর শেষ পর্ব ও লেভেল ৩)।

সিলসিলার কিতাব: ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের 'কাম সতীত্ব রক্ষা' অধ্যায়, যুগ খলিফার তাজা নির্দেশনা পুস্তক। সেই সাথে, উপরে উল্লেখিত লেভেলের সিলসিলার কিতাব ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দ্বীনিমালুমাত: ইসলামী ইবাদাত ৮ম পরিচ্ছেদ): আল্লাহ্ তা'লা, ইসলাম, কুরআন মজীদ, খাতামুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা.), মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), হাদীস, বিবিধ-১, বিবিধ-২।

আতফাল (কমর) বয়স: ১০-১২– তালিমী বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী (লেভেল ২ এর শেষ পর্ব ও লেভেল ৩)।

দ্বীনিমালুমাত: ইসলামী ইবাদাত ৮ম পরিচ্ছেদ): আল্লাহ্ তা'লা, ইসলাম, কুরআন মজীদ, খাতামুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা.), মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), হাদীস, বিবিধ-১, বিবিধ-২।

আতফাল (সিতারা) বয়স: ০৭-০৯– তালিমী বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী লেভেল-১, লেভেল-২ এর প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব।

০৮। রচনা প্রতিযোগিতা: (সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৬ এর মধ্যে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর পাঠালে নম্বর কাটা যেতে পারে)।

খোদ্দাম: ফেসবুক একটি ক্ষতিকর সামাজিক মাধ্যম / অ-আহমদী ছেলে কিংবা মেয়েকে বিবাহের কুফল (সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দ)

আতফাল: নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ত ও ফযিলত (সর্বোচ্চ ১০০০ শব্দ)।

৯। কুইজ: দলগত (খোদ্দাম ও আতফাল পৃথকভাবে)।

বিষয়বস্তু: ইসলামিক জ্ঞান, সাধারন জ্ঞান ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ।

তারেক আহমদ
সেক্রেটারী
৪৫তম জাতীয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এর নতুন চ্যানেল MTA International AFRICA এর উদ্বোধন

গত ১ আগস্ট ২০১৬ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল আল্ খামেস (আই.) আফ্রিকা মহাদেশের আহমদীদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের প্রতি লক্ষ রেখে ও তাদের সুবিধার্থে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল, আফ্রিকা নামে নতুন একটি স্যাটেলাইট চ্যানেলের শুভ উদ্বোধন করেন।

হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) লন্ডনের ফযল মসজিদ সংলগ্ন এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এর সম্প্রচার বিভাগ থেকে এর শুভ উদ্বোধন করেন। হুযূর (আই.)-এর সরাসরি বাটান প্রেস করার মধ্যে দিয়ে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল, আফ্রিকা চ্যানেলের অফিসিয়ালি সরাসরি সম্প্রচার আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন পাঠ ও অনুষ্ঠান প্রচার সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রচারের মধ্যে দিয়ে এই চ্যানেলের যাত্রা আরম্ভ হয়। হুযূর (আই.)-এর দোয়া পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এর উদ্বোদন করেন।

এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল, আফ্রিকা নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সব অনুষ্ঠান সম্প্রচার সহ প্রতি সপ্তাহের জুমুআর খুতবা ও বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত হুযূরের বক্তৃতাও প্রচার করবে। এ ছাড়াও আফ্রিকানদের জন্য সময়োপযোগী বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য ১৯৯৪ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রয়াত ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এমটি ইন্টারন্যাশনালের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। এমটিএ আফ্রিকা হচ্ছে, এই ধারাবাহিকতার আরও একটি অনন্য মাইল ফলক।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

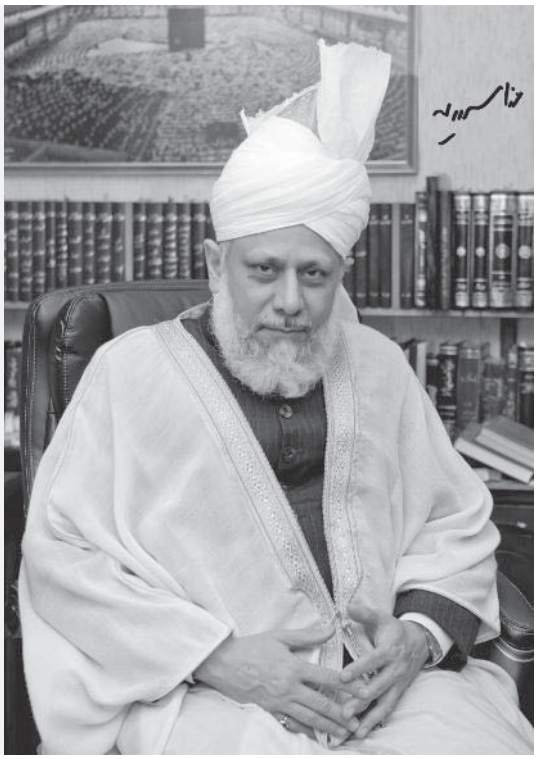

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 4th & 5th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th September, 2016 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)-১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

ধানসিড়ি রেস্তোরা
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com